বাস্তবের দু' পৃষ্ঠা।

প্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

প্রকাশক—শ্রীসুবোধ মৈত্র।
কল্যান পাবলিশিং হাউস্।
১৮।২এ অনরেট ফাষ্ট লেন,
কলিকাতা।

১৩৭০

দুই টাকা

প্রিণ্টার :—জেনারেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
৮৩ ওল্ড চিনা বাজার, কলিকাতা।

শ্রীমতী ইন্দু রায়-কে দিলাম—

ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন।

প্রসাদ।

২০শে ভাদ্র, ১৩৪১ সাল।

আমার যা বলবার আছে।

'I have no eyes above my brain' কথাটা এত বড় সত্য যে এর ভূমিকা দিয়ে বিষদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলা নিরর্থক। ইংরেজী সাহিত্যের যে লেখক এই অমরবাণী কোরেছেন তাঁর লেখার প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে দেখতে পাই এই বাণীর সার্থকতা, এর মূল্য, এর প্রভাব সমস্তটা সাহিত্যের ওপর! এই জন্যেই বোধ হয় তাঁর স্ত্রী চরিত্রগুলোকে কোন কোন খ্যাত নামা সমালোচক mediocre বলে একটু খাটো করবার চেষ্টা করেছেন, প্রত্যুত্তরে লেখকেরই পক্ষ্যান্বেষী অন্য সমালোচকেরা যা বলেছেন,—সেটা আঘাত দিলেও বোধ হয় রূঢ় সত্য —(অন্ততঃ পক্ষে তখন ছিল নিশ্চয়ই) মেয়েরা সত্যিই mediocre! কথাটার আমি সমালোচনা কোরতে চাইনা, শুধু কথাটা তুলে দিলাম!

যে বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে সেটা হোচ্ছে ঐ অমরবাণী টুকু! সাহিত্য গড়ে তুলবার এমন সুন্দর ভিত্তি বোধ হয় আর নেই। সাহিত্য যদি বাস্তবের একটা নিখুঁত ছবি হয় তবে ওটাই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি হওয়া উচিত। বোধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রথম আলিঙ্গন হয় রূপের, মানুষ যে দিন পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলেছিল সে দিন তার

উপলব্ধি হোল রূপের! রূপ আকাশ জোড়া, ধরনী ভরা, পায়ের তলায় সাগর রূপের তরঙ্গে উচ্ছলিত। সে উচ্ছাস তার প্রাণে গিয়ে আঘাত করলো! তার ইন্দ্রিয় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো রূপের স্পর্শে, তার প্রাণে হিল্লোল এল রূপের তরঙ্গে। আজও প্রত্যেক মানবের জীবনে এই অভিজ্ঞতা নতুন করে আসে! মানুষের প্রাণ জড়তার বন্ধন থেকে মুক্তি পায়—রূপের মোহন স্পর্শে! জড়ত্বের পর জীবত্ব। জীব চঞ্চল প্রাণ শক্তির বিদ্যুৎহিল্লোলে সর্ব্বদা সচেষ্ট ও সক্রিয়। সে রূপের পূজারী রূপের ভিখারী! রূপই তার কাছে একমাত্র সত্য! যেখানে রূপের ধরণী মিশেছে স্বরূপের সঙ্গে সেখানেই মানুষের দৃষ্টি হয় নিবদ্ধ! সে হয় আর্টিষ্ট!

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বাংলার শ্রেষ্ঠ ছন্দবিদ্ শ্রীঅমূল্য ধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, আর, এস্, ঠিক এই অভিমতটাই পোষণ করেন এবং আমরা দুজন যত দিন থেকে সাহিত্য সেবা করে আসছি প্রতি মুহূর্ত্তে ঠিক এই কথাই আমাকে বলে আসছেন এবং আমার এক পত্রিকায় একদিন এই কথাই বলেছিলেন। কথাগুলো শ্রেষ্ঠ সত্য তার যোগ্য কথা! সাহিত্য সম্পর্কে এত বড় খাঁটি কথা খুব কম লোকেই বল্‌তে পেরেছেন। সত্য সাহিত্যের এটাই হ'লো শ্রেষ্ঠ ভিত্তি।

রূপ সত্য—সাহিত্য সত্য! সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হ'লো রূপের—রূপ আদি। সাহিত্য এল অনেক পরে। মানুষ চঞ্চল হ'লো রূপের সংস্পর্শে তার চেতনা এলো, তার ইন্দ্রিয় হ'লো সচেতন; সে হ'লো জীব—জড়ত্ব গেলো দূরে! রূপই আনলো জীবত্ব! রূপের পূজারী হ'লো অনেকে-কিন্তু সকলে নয়। সকলের জন্য তারা আঁকলো রূপের নিখুঁত বাস্তব ছবি—সৃষ্টি হ'লো সাহিত্যের। রূপ প্রত্যক্ষ! সাহিত্যও হোক প্রত্যক্ষ। রূপের মধ্যে যেমন ছল কৌশল নেই আছে স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যের ওপর বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ, সাহিত্যও হবে তেমনি তার সঠিক চিত্র মাত্র—স্বভাব

জাত রূঢ় বাস্তবের স্পর্শে জীবন্ত! লেখক মালী মাত্র। ফুলের সৌন্দর্য্য তার রূপ, তার দেহ, তার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করবার অধিকার তার নেই সে শুধু সাজাবার বিবিধ ভঙ্গীতে তার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি যতটুকু করতে পারে! ফুলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে হিতোপদেশ শোনাবার অধিকার তার নেই—বরং তার কাঁটা কিংবা ভেতরের কীটটাকে সর্ব্ব সমক্ষে দেখিয়ে দিতে পারে তাতে দশের উপকার হবে!

কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে ভাল হয় যেমনটী আছে তেমনটী রেখে দেওয়া। সাজান বাগানের চেয়ে বনের স্বভাবজাত বাগানের মূল্য বেশী, লেখকের অধিকার শুধু সেগুলো দেখিয়ে দেওয়া। পথে না হাঁটলে সে পথ চেনা যায়না!

পারিপার্শ্বিক রূপ প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। সেখানে কোন কলা কৌশল খাটেনা—ছলবল টেকেনা! তাকে চিরে চিরে নিজের মন মতো কিছু গড়তে গেলে সেটা হয় মিথ্যা—সাহিত্যকে প্রতারণা করা হয়।

আদর্শবাদীরা আমার শ্রদ্ধেয়। জগতে অহরহ যে সব ঘটনা ঘটছে সে গুলোর মধ্যে যে আদর্শ কিছু নেই; তা' থেকে যে কিছু হিতোপদেশ শোনান যায়না এমন নয়—সুতরাং কিছু কিছু আদর্শ এবং হিতোপদেশ ও সাহিত্যে আসতে পারে কিন্তু যা কিছু ঘট্‌ছে, যা কিছু সত্য সবই আদর্শ নয়, সুতরাং বাঁকী অংশটা চাপা দিতে গেলে রূপকে মিথ্যা করা হবে (রূপ সত্য কখনও মিথ্যা হতে পারে না), সাহিত্যকে প্রতারণা করা হবে। বাঁকী অংশটা চাপা না দিলেই উপকার করা হয়। সাবিত্রী মহীয়সী সন্দেহ নাই, সতীশ কে সে পবিত্র ভাবে ভালবাসতো যার জন্য তার এঁটো দেহটাকে তাকে দিতে পারেনি! শেষ পর্য্যন্ত সাবিত্রী এক স্বর্গীয় স্নিগ্ধ আলোতে স্নাতা হোয়েছে, নারীকে খুব সম্মান দেখান হোয়েছে সন্দেহ নাই। মেসের ঝিদের মধ্যে সাবিত্রীকে খুজলে পাওয়া যেতে পারে, তবে সকলকেই সাবিত্রী মেনে নিতে গেলে মেসের সতীশদের বিপদ হবে

অগননীয়। দু'এক জন ছাড়া বাকী সকলেই সাবিত্রীর Sad contrast তাদের পরিচয় দেওয়া দরকার, দিলে মেসের বাবুদের উপকারই করা হবে!

বাস্তবের সমস্ত জায়গায় ঠিক এই একই যুক্তি চলে! আদর্শ ছাড়া বাকী জিনিষটাই বাস্তবের অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে সুতরাং তাকে চাপা দেওয়া তাকে উপেক্ষা করা শুধু সাহিত্যকে প্রতারণা করা নয় সমগ্র জগতের যথেষ্ট অহিত সাধন করা।

আমার দাদা (৺রবীন্দ্র নাথ মৈত্র) একদিন আমাকে বলেছিলেন "বাংলার দুঃখ দারিদ্র আঁকার জন্যেই যেন তোর কলম বিখ্যাত হয়।" সাহিত্য গুরু তিনি, শৈশব থেকে আমার কলম তাঁরই আদেশে চলেছিল সুতরাং প্রতিবাদ করিনি, শুধু বলেছিলাম "দাদা আমার আধুনিক সাহিত্য যা আঁকে সেটাও তোমাদের সমাজে একটা শ্রেষ্ঠ সমস্যা। তা' ছাড়া সত্যকে চাপা দেওয়া, সাহিত্যকে প্রতারণা করা।" প্রতিবাদ তিনিও করেননি করবারও কিছু ছিল না। আপনার চতুঃ পার্শ্বে যে সব ঘটনা ঘটছে সেগুলো রূঢ় সত্য চোখ বুজে থাকলে সেগুলো মিথ্যা হবেনা কিংবা না জানলেই সেগুলো সমাজ থেকে দুর হবেনা বা তাদের অস্তিত্ব লোপ পাবেনা। অজ্ঞান সাধুতা নয়। আর যদি সেগুলো অজ্ঞাত না হয়, যদি সেগুলোকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা জানে তবে সেগুলোকে পুনরাবৃত্তি করতে দোষ কি? অন্যের বলা এবং লেখকের বলার ভঙ্গিতে তফাৎ অনেক। শিল্পীর বৈশিষ্ট্যই ঐ টুকু। এভারেষ্ট্ বা রাস্তার একজন শত ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত ভিক্ষুক লোক হাজার বার দেখ্‌লেও—তাদের ছবি আঁকা হয় অগনন। সমাদর ও অবর্ণনীয়। আদর্শবাদী সনাতনীদের কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ তাঁরা যেন পূর্ব্বাহ্নেই ভবিষ্যৎ গনণা না কোরে বসেন—আমাদের আধুনিক সাহিত্য কী দান করে আগে দেখুন।

আজ এখানেই শেষ করছি। সনাতনীদের হাত থেকে বাংলার

তরুণদের হাতে সমাজ ও দেশের যে অবস্থাটা এসে পড়েছে সেটাকে ভেঙ্গে গড়বার অধিকার তারা যথেষ্ট রাখে। জগতের গতির সঙ্গে তাল্ রাখ্তেই হবে, "ঘরে বসে গর্ব্ব করে পূর্ব্ব পুরুষের" এভাব নিয়ে সপর নিন্দা দাবার আসোর খুব ভাল জমে বটে কিন্তু মনুষত্ব লোপ পায়। অন্ধকার থেকেই যায় বরং বাড়ে। বাংলার বর্ত্তমান তরুণরা সব যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে এদের প্রতিভা ও ক্ষমতা স্বীকৃত। এরা বেঁচে মরে না, মরে বাঁচে।

ভাঙ্গে গড়ার জন্য, সে ভাঙ্গার মূল্য আছে।

এই বই প্রকাশে বন্ধুবর শ্রীশোহন লাল চণ্ডালিয়ার ঋণ পরিশোধ করা যাবেনা! কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুবোধ রঞ্জন মৈত্র-এর অক্লান্ত পরিশ্রম এর প্রকাশের জন্য দায়ী! সুতরাং বইরর জন্য দায়ী ইঁনিই!

রাখী পূর্ণিমা,
কোলকাতা।

প্রসাদ

বাস্তবের দু' পৃষ্ঠা

(প্রথম পৃষ্ঠা)

সবেমাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে! পর্দ্দাটা সরিয়ে সে তার লেখার ঘরে ঢুক্‌লো, এটা তার দৈনন্দিন কার্য্য সুরু করবার সূচীপত্র! কালরাতে একটা নতুন বই আরম্ভ করে' আজ উঠ্‌তে একটু বেশ দেরী হ'য়ে গেছে! তবে এটা আজ তার মিথ্যা কারণ প্রদর্শন, কারণ কোন দিন তাকে কেউ এর আগে উঠ্‌তে দেখিনি! তার স্বভাব, তার ইচ্ছা, তার স্বেচ্ছাকৃত কার্য্য-পদ্ধতির অন্যতম। ভোরেত' সকলেই উঠ্‌তে বলেছে তাই উঠ্‌বে সে দেরী করে। ঘরে ঢুকেই দেখে তার টেবিলের উপর এক গাদা চিঠি, মাসিক-পত্র, সাপ্তাহিক, দৈনিক, ত্রৈমাসিক—নানাবিধ সম্ভার! সে তার দিনের যাত্রা আরম্ভকরে রোজ ঠিক এই একই পদ্ধতিতে! প্রথমেই সে পড়বে সব চিঠিগুলো, প্রত্যেক খানি, প্রতিছত্র, কোনটি বাদ দেবেনা। জীবনের তার শ্রেষ্ঠ কামনা ছিল এইটা, এখন সেটা পূর্ণ হওয়াতে এটা হয়েছে তার সচেতন অহঙ্কার। এই চিঠির তাড়া দেখে তার মনে পড়ে যায় গত দিন-গুলোর জীর্ণ ইতিহাস, প্রত্যেক দিন সে দিনগুলো তার চোখের সামনে একবার করে ভেসে উঠবে! অতীতকে সে ঘৃণা করে, অবিশ্বাস ও, তাই সে নিজে ফিরে চায় না কিন্তু বর্ত্তমানের সাহায্য নিয়ে সে গুলো তার সম্মুখে মূর্ত্ত উঠে।

জীবনে প্রথম চিঠি পায় সে তার দাদাবাবুর কাছ থেকে। সে দিনটার রোমাঞ্চকর স্মৃতি এখনো মনে আছে! তার মা তাকে যখন চিঠিখানা প্রথম দিলেন তখনকার আন্তরিক মনের কার্য্যাবলী গুলো আর মনে নেই, তবে হঠাৎ যেন সে মস্ত বড় হয়ে গিয়েছে, যেন সে তার বাবা হয়ে গিয়েছে (কারণ তার ধারণা ছিল পৃথিবীতে শুধু তার বাবাই চিঠি পায়)। চিঠিখানা (শুধু তাই নয় তার পরে সে যতো চিঠি পেয়েছে) বহু দিন পর্য্যন্ত রেখেছিল (চিঠি জমান তার ছিল শ্রেষ্ঠ হবি)! ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সে যখন প্রথম কলেজে যায় তখন পড়ে যায় তার বাক্সটাকে মার্জ্জনা করার পালা ে-ই সংস্কারের প্রবাহে অনেক গুলো কে ছিড়ে ফেলে, যেমন গ্লোব নার্শারীর পুরে। ; ক্যাটালগ্ , বিশ্বভারতীর বইএর তালিকা, এই রকম আরো অনেক কিছু। তবে তার জীবনের এই প্রথম চিঠিখানা ছেঁড়েনি, এখা ।া সে খানা আছে! সে দিনটা যেন তার জীবন ইতিহাসের একটা যুগান্তকারী দিন। তবুও একটা কথা তাকে সে দিনও একটু দুঃখ দিয়েছিল সেটা এই ভাব যে 'তার চিঠিখানা বাবার অন্যান্য চিঠির মতো বেশ ছোট ছোট অক্ষরে লেখা নয় বরঞ্চ মোটা মোটা বড় বড় অক্ষরে লেখা এবং চন্দ্রবিন্দু সংখ্যা খুবই কম যেটাকে সে খুবই ভাল বাসতো এবং বই বা চিঠি হাতে পেলেই ওই জিনিষটার সংখ্যা সংগ্রহ করতে বিশেষ পরিশ্রম করতো। ইংরাজী ভাষায় ঐ দ্রব্যটীর একান্ত অভাব শুনে সে ভাষাটার ওপরে জন্মেছিল তার শ্রেষ্ঠ বিতৃষ্ণা! এই বড় এবং মোটা অক্ষর গুলো তার বর্দ্ধিষ্ণু চেতনাকে সজোরে এক আঘাত দিয়ে সচেতন করিয়ে দিল, যে সে এখনো অনেক ছোট, এই আঘাতে সে খুবই দুঃখ পেয়েছিল। বালক নিজেকে বড় ভাবতেই সব চেয়ে আরাম পায় এবং ভাবেই। সে তার দাদাবাবুকে জানিয়ে দেয় ছোট অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু বহুল চিঠি দিতে (সে নিজে অবশ্য তার চেয়ে ছোট অক্ষরে লিখতে পারেনি।)

তারপর বয়স, অভিজ্ঞতা, অনুভূতির সঙ্গে চিঠির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি

পেলো, অক্ষরও কিছু ছোট হোয়ে এলো! পৃথিবী ব্যপ্ত হ'লো, মানব জাতি এক সুমহান মহামানব জাতিতে পরিণত হলো, দূর, বহুদূর, নিকট, অতিনিকট নানাবিধ আত্মীয়ের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে জানতে পারলো, কিছু কিছু চোখেও দেখলো! চিঠির সংখ্যা পাবক শিখার মতো সহস্র জিহ্বা ধারণ করলো।

সে বড় হলো। কিশোর বালক তরুণ যুবক হ'ল। তাম্রচ্ছটা কিশলয় সবুজ হলো! চন্দ্রবিন্দু আকৃষ্ট বালক ছবিজগতে প্রলুব্ধ হ'লো। তার মুখে মুখে ফেরে চিত্রাকাশের শ্রেষ্ঠ তারকার বিবৃতি, মনে মনে থাকে তার ছবি, তার ঔজ্জ্বল্য, চোখে থাকে তাদের রূপের আমেজ! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ধরলো রং। কচি হৃদয়ে এই সময় আক্রমণ করলো তার জীবনের সবচেয়ে স্থায়ী ও ভীষণ রোগ। এটা হচ্ছে কবিতা ও গল্প লেখা। এই রোগ বংশ পরম্পরা কিনা ঠিক জানিনা তার বাপ কোন এ রোগের চিহ্ন রাখিনি, অবশ্য যৌবনে লুকিয়ে কিছু লিখতেন বোধহয়, তবে তার কোন নিদর্শন নাই, থাকার মধ্যে আছে জেঠামশায়ের দু-একখানা নাটক ও আছে পাতায় ছাপা তৎকালীন বিখ্যাত লোক ও মাসিকের প্রশংসা পূর্ণ অভিমত। ও নাটক গুলো তাকে ছোঁয়াচ দেয়নি এ ঠিক, কারণ চিরদিন ও গুলো বিশ্রী লেগেছে। এই রোগ শুধু তার ধরলো না, বেড়ে চললো হু হু করে। মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক নানাবিধ কাগজে চললো লেখা, সঙ্গে যেতো উপযুক্ত ডাক টিকিট ফেরৎ আসার জন্য। এই সময় তার চিঠির সংখ্যা গেল বেড়ে অসম্ভব রকম। প্রতিদিন তার চিঠি আসতে লাগল, একমাস, দুমাস, তিনমাস……। লেখা ফেরৎ আসে। এতে সে আনন্দ পায় না; শেষে পিয়নের আবির্ভাব হ'লো তার ভীতি, অসন্তোষ, দুঃখের কারণ। ভয়ে সে পূর্ব্বের মতো যাচিত ভাবে তার চিঠি গুলো সাগ্রহে নিতোনা, পিয়নকে দেখে সে কোন আড়ালে লুকতো, আর দেখতো পিয়নের চিটি দেওয়া। তার উপস্থিতি থেকে

আরম্ভ করে প্রস্থানের শেষে পদক্ষেপটুকু তার কাছে বিসদৃশ লাগতো! শেষে সে বলতো ভগবান আজ যেন আমার চিঠি না আসে! এই অভিনয় চললো, সে এলো কলকাতায় কলেজে পড়তে অভিনয়ের যবনিকা টেনে!

এর পর চিঠির অভিনয়ের তৃতীয় দৃশ্য। যুবকের আকাশ হ'লো ব্যপ্ত, পৃথিবী পরিসর, বাতাস গভীর। মনে নেশা লাগলো, নারী মিষ্টি হলো। স্থানে, বিদেশে কত নারী বন্ধু জুঠলো, ভালবাসা হলো (এবং এটা হবেই) চললো চিঠির ব্যবসায়। পুনরায় চিঠির প্রত্যাশা, প্রত্যহ ডাকের সময় চিঠির দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থাকা, কোন চিঠি অ[illegible]ল্ সেটাকে থেকে থেকে থেমে থেমে অন্ততঃ পক্ষে পঁচিশবার পড়া। কোন চিঠির উত্তর দিয়ে দুদিন পরেই প্রত্যহ তার প্রত্যুত্তর আশা করা।

এ নাটকের আজ চতুর্থ দৃশ্য! এ দৃশ্যটা গত দৃশ্য গুলোর যা কিছু বিসদৃশ্য ও কটু তা বাদ দিয়ে শুধু বাঞ্ছনীয়ের চমৎকার সমন্বয়।

আজ কয়েকদিন হ'লো তার একখানা নতুন বই বেরিয়েছে। এই বই এনেদিয়েছে বাংলা সাহিত্যে এক ভীষণ চাঞ্চল্য। শত শতাব্দীর পঙ্কিলাবদ্ধ পরিসর স্থির স্রোতহীন জলে উত্তাল তরঙ্গ দুইতীরে সজোরে আঘাত করাতে নিশ্চিন্ত চিত্তে পরিবর্দ্ধিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছা গুলো সমূলে উৎপাটীত হয়েছে! সে স্রোতের চক্রাকার রেখাগুলো এখনো বিলীন হয়নি। আজ কয়েকদিন তার যতো চিঠি আসছে সব ঐ সম্পর্কে। পৃথিবীর আবহমান কাল থেকে প্রবর্ত্তিত রীতির লঙ্ঘন এখানেও হয়নি। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অভিমত, লেখক বন্ধুদের প্রশংসা ও শ্লেষ পূর্ণ, দীর্ঘ পত্র, অসাহিত্যিক বন্ধুদের (যাঁরা অনেক বই না পড়েই সমালোচনা লেখেন) প্রশ্নহীন বা ভিত্তিহীন গ্রাম্য বধুর মতো নিরর্থক চিঠি, তাতে তাঁরা বোধহয় চেষ্টা করেছেন তীব্র শ্লেশপূর্ণ একটা মন্তব্য পাঠাতে (পারেননি বোধহয় critical মেধার অভাবে)। অতি আধুনিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভক্ত তরুণ

তরুণীর কাছ থেকে যে চিঠি আসে তাতে থাকে শুধু প্রশংসা, বিরাট আকাশে তার মতো তারার ঔজ্জ্বল্যের স্থান নিদর্শন, অবশেষ থাকে চিঠি উত্তর পাবার সানুনয় অনুরোধ। আর থাকে বিবিধ সাময়িক পত্রের অনুরোধ তাদের কাগজে লেখা দিতে।

আজ যে ডাক এসেছে তাতে ঐ রকমই দ্রব্য সম্ভার। সমস্ত চিঠিগুলো সে একে একে পড়লো। এক খানা চিঠি একটু বিচিত্র, লিখেছেন একজন মহিলা (তরুণী) ! তার বইখানা পড়ে এঁর কি মনে হয়েছে তারই একটা মন্তব্য। বইখানা অন্তত পক্ষে তিনি পড়েছেন এবং মন্তব্যে তাঁর সমালোচনী তীব্রমেধার ছাপ। চিঠিখানা প্রথম থেকেই শুধু প্রশংসার সুর তারই মুর্চ্ছনায় 'কিন্তু' তাহলেও প্রভৃতি শব্দ দিয়ে একটু অন্য পথের স্পর্শ আছে। প্রশংসা পর্ব্বের পর তিনি লিখেছেন—

* * * বরাবরই একটা জিনিষ আপনার লেখায় লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে আপনার সচেতন অহঙ্কার এই বিষয়ে যে আপনি পুরুষ। (আপনি) আপনার নায়ক তার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নারীকে ভাল বেসেছে, তার কাছে যা কিছু প্রাপ্য তা নিয়েছে, যতদিন তার দেহ না পেয়েছে তত দিন তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি (এই দেহই নাকি একমাত্র জিনিষ যার জন্য নারীকে পুরুষ চায়, ভালবাসা দৈহিক আকর্ষণেরই রূপান্তর মাত্র)। পর মুহূর্ত্তেই তাকে ছেড়ে অন্য মেয়েকে ধরেছে, তারপর আর একজন। নারীর অন্তরদাহ জ্বালানই আপনার নায়কের শ্রেষ্ঠ কামনা, অগনন নারীর দেহের স্বাদ পাওয়াই তার চরিত্রের চরিতার্থতা। এবার আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি নিজে কী আপনার জীবনে এতো গুলো মেয়ে নিয়ে খেলেছেন বা ভবিষ্যৎ জীবনে খেলতে পারবেন? এতবড় দুঃসাহসিকতা কী আপনার আছে? (অবশ্য কৃতকার্য্য হতে পারলে এটা আপনার শ্রেষ্ঠ শক্তি) না এটা আপনার ব্যক্তিগত জীবনের অক্ষমতার psychological প্রতিক্রিয়া

মাত্র! মানসিক ইচ্ছাকে ভাষায় রূপদিয়ে তাকে চরিতার্থ করছেন? * * * যাক অনেক কিছু লিখলাম আশা করি কিছু মনে করবেন না। শুনেছি আপনি স্পষ্ট বাদের ও true criticism এর ভয়ানক পক্ষপাতী। তাই লিখলাম! কাল আপনার সঙ্গে সকালে একবার দেখা করবো আশা করি দেখা পাবো। * * *

চিঠি খানা তার খুব ভাল লাগ'ল! বাংলার মেয়েদের মধ্যে এমন স্পষ্টবাদী সে খুব কমই দেখেছে! তীক্ষ্ণ মেধা ও সূক্ষ্ম পাঠের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল তার চিঠিটার মধ্যে, তবুও নারী, তার অন্তরের পুবিশ্বপুরুষ একটু সঙ্কুচিত হ'লো! চিঠিখানা বন্ধকরে রেখেদিয়েছিল, আবার খুললো! সুন্দর চিঠির কাগজ, ওপরে নাম, বাড়ীর নাম, নম্বর, বাড়ীর ও ফোনের, ততোধিক সুন্দর তার হাতের লেখাটী। একটা জিনিষ সে শৈশব থেকে লক্ষ্য করেছে সেটা সুন্দর হাতের লেখা প্রায় প্রত্যেক মেয়েটির, ভাল অর্থাৎ পড়তে পারা যায়। কিন্তু একটা জিনিষ তার বিষদৃশ্য লাগত সেটা হচ্ছে এইযে প্রায় প্রত্যেকেই চেষ্টা করতেন রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির ঢং তাদের লেখায় আনতে। ওতে লেখাটা দেখতে সুন্দর হয় কিন্তু লেখার ধর্ম্মচ্যুতি হয়। ও সৌন্দর্য্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙ্গিয়ে উপভোগ করা চলে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ভাবে, কিন্তু কাছে এনে ওর রস বোধকরা চলে না। তাই ওর ছিল বিতৃষ্ণা রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির ওপর। অনেকে বলতো ওটা ওর নিজের অক্ষমতার প্রতিক্রিয়া। সে অস্বীকার করতো।

তার নিজের ফোন ছিল না। গেল এক বন্ধুর বাসায়। ফোনে তার তরুণী ভক্তকে জানিয়ে দিলে যে কাল সকালে তার previous engagement থাকায় সে বাড়ীতে থাকতে পারবে না আশা করে ক্ষমা করবেন। বুধবার সকাল সাড়ে আটটায় সময় ধার্য্য হোলো। নমস্কার জানিয়ে ফোনে বিদায় নিলো।

প্রকৃত পক্ষে তার কোনই previous engagement ছিল না। মেয়েদের ঘোরান তার একটা স্বভাব।

বুধবার। প্রকাশ এইমাত্র ঘুমথেকে উঠলো। মাথার কাছে টেবিলের উপর থেকে চাবি দেবার জন্য ঘড়িটা তুলে দেখে আটটা বেজে দশ। আজ মিস অমামি আসবেন—হঠাৎ সেটা মনে পড়ে গেল। নৈশ বেশটা ছেড়ে অন্য বেশ পড়লো। সেদিনকার ডাকটা শোবার ঘরেই আনিয়ে নিলো। চিঠিগুলোর শিরোনামার ওপর চোখ বোলাচ্ছে, কোনটা ছিঁড়ে তার অঙ্গটা ও নীচের নামটা দেখে নিচ্ছে! বেয়ারা এলো একখানা কার্ড নিয়ে, দূর থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল সব! তাঁকে তার ড্রয়িং রুমে বসতে আদেশ করে' নিজে একটু দেরী করলো, অনর্থক।

প্রকাশ ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখে মিস্ অমামি অর্থাৎ একজন অতি আধুনিক সুন্দরী তরুণী বসে! মুখে-বুকে, হাতে পায়ে, বেশভূষায়, সুরভিতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে আধুনিক। সংক্ষেপে এইটুকু বলা চলে যে রাস্তায়, ঘাটে, ট্রামে, বাসে, জু'তে, যেখানে হোক তাঁকে দেখে তার প্রেমে পড়া চলে। তিনিও বহু বড় বড় মাছ খেলিয়ে তুলতে পারেন।

নমস্কার ও আনুসাঙ্গিক ক্রিয়া শেষ হবার পর অমামিদেবী বলেন—"আপনার অনেকটা সময় হয়তো নষ্ট করবো—বিরক্তও যথেষ্ট" চোখে একটুকরো হাসি দেখা গেল তার অর্থ এই যে ওসব বাজে কথা আমার উপস্থিতি দিয়ে আপনাকে ধন্য করলেম।

"এখন আর তার জন্যে আপশোষ করে কিছু লাভ নাই, ওর জন্য আমরা দুজনেই ত' প্রস্তুত হয়ে আছি—"

অমামিদেবী একটু আঘাত পেলেন বোধ হ'লো। তিনি নিশ্চয়ই ঐ রকম উত্তর আশা করেন নি।

"দেখুন আপনার নতুন বইখানা সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনার মত পাবো কী?"

"By Jove—নিশ্চই পারেন।"

"চিঠিতে যা লিখেছিলাম ঠিক সেইটাই আমার মৌখিক প্রশ্ন! ব্যক্তি-গত ভাবে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো।"

"ওঃ—ও, সেই প্রশ্ন, ওগুলো আর আপনাকে কষ্ট করে repeat করতে হবেনা—আমিই উত্তর দিচ্ছি। দেখুন একটা কথা! আপনাদের শ্রেষ্ঠ defect হচ্ছে এই যে আপনারা নায়ক আর লেখককে identical ধরে বসেন—ঠিক এই ভাবে শরৎ বাবুর শ্রীকান্তখানা আপনারা rubbish heaps এ পরিণত করেছেন—চতুর্থ খণ্ড তার জলন্ত প্রদান।"

"কিন্তু সত্যের ছায়া থাকলে সে জিনিষ সবচেয়ে ভাল খোলে—এমন বহু নিদর্শন দিতে পারা যায় এবং এটা সকলেই মানেন।

"আমিও, কিন্তু ওর converse সত্যি নয়। আপনাকে একটা অভিমত জানাই তা থেকেই বুঝতে পারবেন পৃথিবীতে মানুষের চিন্তাধারা কেমন বিপরীতমুখী। আমার বিখ্যাত সমালোচক বন্ধু বলেন মানুষ যেটা চায় অথচ পায় না সেটাই প্রকাশ করে তার মেধার ভিতর দিয়ে। আর এক বন্ধু বলেন ঠিক তার উল্‌টো।"

"আচ্ছা আপনিকি মনে করেন জগতের মেয়েগুলো পুরুষের চেয়ে কম বুদ্ধি ধরে?

They are So many landscapes lit by the youth—আপনার বইতে কিন্তু সেটাই প্রকাশ পেয়েছে।"

"কিসে বুঝলেন?"

"কেন আপনার নায়ক অতগুলো মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলল পর্য্যায়ক্রমে তাদেরকে হতাশ করলো এটা কী সম্ভব? মেয়েগুলো কী এতই নির্ব্বোধ? আমার মনে হয় এটা লেখকের অনভিজ্ঞতার ফল।

"দেখুন অতবড় দোষ মহা শত্রুতেও দিতে পারেনি। আধুনিক সাহিত্যের লেখক বেশ্যা বাড়ীতে বসে তার গল্প লেখে। তার বুকে

কান পেতে তার বাণী শোনায়, আপনাদের রবিবাবুর মতো উত্তরায়ণে বসে পূর্ব্ববঙ্গের বন্যার দুঃখের কবিতা লেখেনা।"

"আপনি কী জীবনে অতো মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন? ভাবতেও কী পারবেন? আমার মতো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি নিশ্চয়ই" অমামি একটু গর্ব্বের হাসি হাসে, তাতে সচেতন আত্মগরিমার গন্ধ। শব্দহীন হাসি সবচেয়ে বেশী অর্থপূর্ণ।

"You are too frank অমামি দেবী! আমি এটা খুব পছন্দ করি। দেখুন যে মেয়ে নিয়ে খেলেছি তারাও আপনার চেয়ে কম বুদ্ধিমতী ছিল না—আমি বোধহয় একটু ব্যক্তিগত হয়ে পড়েছি আপনার তরফ থেকে আমারও; তবুও—কিন্তু ভালবাসার ক্ষেত্রে আপনাদের সমস্ত বুদ্ধি, মেধা, Shakespeare, Burke, Browning সব এক হয়ে সেই 'বাংলার বধু' বুক ভরা মধু'তে পরিণত হয়। পুরুষকে চাইই! সেক্ষেত্রে সব অন্ধকার! পুরুষ না হলে নারীর চল্‌বে না অমামী দেবী—কিন্তু—। কোন জায়গায় পুরুষ বেশ্যা দেখেছেন কী?"

অমামী দেবী ভ্রূ একটু কুঁচকে ওঠে—অর্থাৎ তাঁর যুক্তি চূর্ণ হওয়াতে জয়দীপ্ত আসা বিলীন হয়, রেখে যায় শুধু কপালে দুটী রেখা।

"আপনি একবার trial দিন না"—প্রকাশ চরমে ওঠে! অমামি দেবীর বুক খানা একটু সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। দুঃখিত হন না, ভাব দেখে বোধ হয় তিনি আর একখানা অস্ত্র শানাচ্ছেন। আধুনিক মেয়েদের একটা শ্রেষ্ঠ গুণ তারা তর্কে হেরে রাগ করে না, অভিমান করেনা, বরং সুখী হয় অর্থাৎ আরও তর্ক করে।

কথায় কথায় বেলা হয়েছিল বেশ। অমামী দেবী জানালেন তাঁর যাবার সময় হয়েছে, দশটার সময় ঠিক হাজির না হ'তে পারলে আবার জীবনের পরীক্ষায় প্রবেশ পত্র পাওয়া হবে একটা সমস্যা।

"আপনি কি কলেজে পড়েন? নিশ্চয়ই পড়েন!" প্রকাশ কথাটা

ব'লে তার বুক থেকে পা পর্য্যন্ত এক ঝলক দেখে স্থায়। তার মতে কলেজের মেয়েদের একটা বাইরের আড়ম্বর একটু বেশী পরিমাণে আছে। তারা সর্ব্বদা সচেতন তাদের এই উচ্চশিক্ষার জন্য। একই ক্লাশের ছেলেদের সঙ্গে তারা একই বেদীতে দাঁড়াতে চায় না। তার মনে পড়ে তার কলেজীয় জীবনের কথা। সেখান থেকেই তার অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা দৃঢ় হয়েছিল ভবিষ্যৎ জীবনের অভিজ্ঞতায়! মেয়েরা সাধারণতঃ মিশতে চায় কলেজের অধ্যাপক দের সঙ্গে (এবং তাঁরাও চান মেয়েদের সঙ্গ পেতে) তাদের কথা বার্ত্তা পরামর্শ অধ্যাপকদের সঙ্গে হয় তাদের বাড়ীতে, লাইব্রেরীর নিভৃত স্থানে (যেখানে হঠাৎ কোন ছেলে উপস্থিত হলে দুজনেই অসন্তুষ্ট হতেন), অধ্যক্ষের সঙ্গে হাসি তামাসা! একটা জিনিষ তার সব চেয়ে স্পষ্ট মনে হতো সেটা এই যে কোন অধ্যাপক হয়তো একটু আগেই একটা মেয়ের সঙ্গে প্রাণ খুলে হেসে Keats বা Byron এর প্রেমের তথ্য বিষয়ে বোঝাচ্ছিলেন (সে সময়ে হয়তো তিনি নিজেকে ভাবেন Lycious আর মেয়েকে Lamia, চোখের চাউনি টুকুর ভাব A moment's thought is passion's passing bell) ঠিক সেই লোকই ক্লাশে চৌরঙ্গীর Statue র মতো Burke এর নীরশ তর্ক যুক্তি বোঝালেন Byron কে অপমান করলেন। মেয়েদের চলার প্রতি পদক্ষেপ টুকু স্বাতন্ত্র, দেখে মনে হয় তাদের পদক্ষেপে vice-chancellor ধন্য, অধ্যাপক ধন্য, কলেজ ধন্য ছেলেদের সতৃষ্ণ নয়ন তাঁদের স্যাণ্ডেলের সাথে সাথে থাকে, এই তাদের ধারণা। প্রকাশের অসহ্য বোধ হতো। তাই আজ অমামি দেবী একটু আশ্চর্য্যান্বিতা হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—

"কী ক'রে আপনি বুঝলেন ; এটাও কী writer's sight"

প্রকাশ তার অভিজ্ঞতার ফল জানায়। তার অভিমত শুনে অমামি দেবী একটু মর্ম্মাহত হন ! তিনি এবার একটু প্রজ্জ্বলিত হন মনে মনে। তিনি যে ধারণা নিয়ে এসেছিলেন প্রকাশ তাত' নয়ই বরং বিভিন্ন ! মেয়েদের

সম্বন্ধে যে কী তার ধারণা তা আজ পর্যন্ত তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুও বুঝে উঠ্‌তে পারিনি সে নিজে ও না! সে নারীকে ঘৃণা করে না বরং প্রতি মুহূর্ত্ত বোধ হয় চায়, শুধু চায় না, চায় তাকে সম্পূর্ণ ভাবে পুরুষ নারীকে যথার্থ যে জন্য চায়, যুগ যুগ ধরে চেয়ে এসেছে শুধু যে জন্য।

"আচ্ছা প্রকাশ বাবু আপনি কী নারীর বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহী; কী কারণ; এটাকী আপনার জীবনের disappointment এর প্রতিশোধ।" কথার সুরে মনে হয় অমামি সত্যিই আন্তরিক বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। নারী সবচেয়ে দুঃখিত হয় তাকে প্রেমের ভিখারিনী করলে! পুরুষ প্রেমের ভিখারী হ'তে গর্ব্ব অনুভব করে।

"হতাশ! আমি যতো নারীর সঙ্গ পেয়েছি আপনি ও ততো পুরুষের সঙ্গ পাননি। প্রত্যেকটী মেয়ে উৎসুক আমার সঙ্গ পেতে" প্রকাশ একটু গর্ব্বের হাসি হাসে!

"আমিও কি সে তালিকা ভূক্ত! আমাকে দেখবার পর নিশ্চয়ই আপনার list বদলাবে" কথাটা অমামি দেবী বলেননা বলে তাঁর চিন্তা ফেনিল হৃদয়।

"কী করে বলি।" প্রকাশ আবার আঘাত করে।

সেদিন আর অমামির কলেজ যাওয়া হলোনা অর্থাৎ গেল না। বাড়ী এসে তার মনটা আরো বিক্ষুব্ধ হলো। প্রকাশের কাছে পরাজয়ের কথা তার সম্মুখে স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারিনি দূরে সরে এসে সেটা স্পষ্ট অনুভব করতে পারল! প্রকাশের ঔদ্ধত্ব তার কাছে অভদ্রতা বলে বোধ হতে লাগল। পুরুষ! পুরুষ! উঃ পৃথিবীটাকে যেন কিনে রেখেছেন তার পুরুষত্ব দিয়ে। "কোন জায়গায় পুরুষ বেশ্যা দেখেছেন!" কথাটা তার কানে এখনো বিঁধছে। সে যদি বাংলার লাট হতো, সে যদি ভারতের বড়লাট হতো আজই দিতে সব বেশ্যাদের ব্যাবসায় বন্ধ করে প্রকাশকে দিত বুঝিয়ে যে মেয়ে বেশ্যাও আর নেই এই পৃথিবীতে।

প্রকাশের লেখার প্রত্যেকটা অক্ষর তার কাছে এক একটা বিষের টুকরো বলে বোধ হতে লাগল। নারীকে চাই তবুও তাকে এত ঘৃণা? তার সঙ্গে প্রকাশের ব্যবহারটাও আজ অমামির কাছে অত্যন্ত নীচ বলে বোধ হ'তে লাগল! বিদ্রোহীর কি ভদ্র হতে নেই। সম্পূর্ণ উদাসীন। অমামির মনে পড়ে গেল তাদের কথা যারা অমামির সঙ্গ এক মুহূর্ত্ত পেলে নিজেকে সার্থক মনে করে, তার প্রতি অঙ্গের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অনাবৃত অঙ্গের স্পর্শ পেতে হলে সেটাকে মহেশের সাধনা যোগ্য মনে করে আবৃত অঙ্গের স্পর্শ বা দর্শন লাভ তারা মনে করে বোধ হয় তাদের জন্মগত অধিকারের বাইরের সাধনা। অমামির কথার শেষ টানটুকু তারাই সম্পূর্ণ করতো। আহা বেচারারা! তাদের উপর অমামির দয়া হয়! তাদের কাছে অমামি গ্রেটার মতো মায়াবিনীই থেকে গেল, এতোদিন তাদের কে ফাঁকি দিয়ে খেলিয়েই এলো! তারা মনে করতো অমামি একটা "huge intellectual" সাধারণ নারীর গণ্ডির বাইরে! অমামিও কখনো নিজের নারীত্বকে অনাবৃত করেনি। অমামি দূরে থেকে গেল তাদের কাছে চিরদিন! তারাওতো কেউ 'লোফার' নয়, কলেজের প্রফেসর থেকে নবীন ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত! লেখক! লেখক কী জগতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! অমামির অন্তর এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না। অজ্ঞাত শৈশব থেকে লেখকদের ওপর অমামির এক অজ্ঞাত অসীম শ্রদ্ধা! লেখকের আসন সে সকলের ওপর সংস্থাপন করেছে। নিজেও লিখতো, লিখতে লিখতে যে বিখ্যাত হয়েছে তাকে সে কি যেন একজন ভাবতো! প্রকাশ তো সেই লেখক শুধু লেখক নয় আজ বাংলায় তার লেখা নিয়ে একটা ভীষণ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে! প্রত্যেকে জানে তার নাম, তার কথা নিয়েই প্রতি মুহূর্ত্ত প্রতি স্থানে সমালোচনা! উঃ! অমামির বিদ্রোহী হৃদয় নেমে আসে প্রকাশের পায়ের কাছে! সে আর ভাবতে পারছেনা!

"কীরে তুই এখনো শুয়ে যে কী হয়েছে তোর! এই তো বেড়িয়ে এলি! কলেজ নেই আজ?" মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন।

অমামি তার বিছানায় শুয়ে পড়েই উত্তর দিল—"না মা আজ বড় মাথাটা ধরেছে—কলেজ আর যাবোনা।"

যা কক্ষনো নিজে করেনা বা কাউকে করতে দেয় না, আজ নিজে তাই করলো—দুপুরে ঘুম দিল! ঘুম না দিলে তার উপায় ছিল না! জেগে থাকলে তার মন হয়তো তার অজ্ঞাতে প্রকাশের কাছে ধরা দিত! কেন? এতো আকর্ষণ কেন? কী আছে প্রকাশের? সুপুরুষের ত' কলকাতায়—তার পরিচিতের মধ্যে অভাব নেই। কিন্তু অমন চোখ! যেন আগুন জ্বলছে আর তার পাশে আছে পিপাসার বারি! স্থির, ধীর, শান্ত! এই যে এতো গুলো কথা বললো, কপালে একটী রেখা পড়েনি, মুখে হাসিটুকু লেগেই ছিল! ওই হাসিটুকুই অমামিকে দগ্ধেছে, তাকে মুগ্ধ করেছে, তাকে বিদ্রোহী করেছে! অমামি আর ভাবতে পারছিল না। কলকাতায় মুখে মুখে প্রকাশের কথা! তার সঙ্গে পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত, অপরিচিত—সকলেই সত্যি মিথ্যার অপূর্ব্ব জাল বুনিয়ে সাক্ষাৎ হ'লেই জানাবার সুযোগ ছাড়তোনা প্রকাশের সঙ্গে পরিচয়ের কথা! তার মেয়ে বন্ধুদের মুখে শুনে শুনে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল! শুধু প্রকাশ, তার প্রশংসা, তার লেখা, তার সুখ্যাতি! অমামি এতো দিন ইচ্ছা করেই প্রকাশের সঙ্গে দেখা করেনি!

"তোরা যে অনর্গল পাঁচ মুখে তার কথাটা বলিস—তার লভে পড়েছিস নাকি?" অমামি মহা বিরক্ত হ'য়ে একদিন রেবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

"লভে—By jove! কত চেষ্টা করলুম। সে কিছুতেই নামলনা! এতদিন ঘুরেই মরলুম শুধু! জানিস ভাই একটা কথা, তোকে বলতে আমার কিছু নেই! এই আমার last জন্ম দিনে তাকে গেলুম invite

করতে! বললুম—"তুমি কী দেবে আমাকে— (আমরা 'তুমির' stage এ পৌছেছিলুম)।"

"যা দেবো নেবেত?"

"নেবো না তোমার দান!"

"দুটো জিনিষ দেবো—একটা সেখানে অর্থাৎ কাল, একটা এখানে, নিয়ে যাও! আজকেরটা নেবেত? লজ্জা করবেনা?"

"কিছু না তোমার কাছে লজ্জা! বলে তার গলাটা জড়িয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিলুম! সে বল্লো উহুঁ! আমি মুখে চুমু দিনা! ওটা প্রথম stage! তুমি এতো পরিচিত!"

"তবে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম"

"নগ্ন বুকে!" সে প্রাণ খুলে হেসে উঠলো! প্রকাশ ভাই সত্যি charming, আকর্ষণী শক্তি আছে চোখে বাহুতে।

অমামির একে একে সব মনে পড়তে লাগলো, প্রাণটা আরো ক্ষত হ'তে লাগলো! আকর্ষণী শক্তি! সেও নিজে যেন এটা অনুভব করছে! রেবাটার ওপর এমন একটা ভীষণ বিতৃষ্ণা হতে লাগল! তখন তাকে "পোড়ার মুখী" বলেছিল, এখন কাছে পেলে সত্যি দিতো পুড়িয়ে তার মুখ জ্বলন্ত লৌহ শলাকা দিয়ে।

অমামি প্রতি শোধ নেবে! সে বাংলা সাময়িক পত্রে লিখবে ক্রমশঃ ভাবে প্রকাশের লেখার তীব্র সমালোচনা! প্রকাশের প্রকাশিত সমস্ত গুলো বই কিন্‌ল। একবার দুবার বহুবার সে গুলো সে পড়লো! সত্যি তার যুক্তিগুলো চমৎকার, ভাষার মাধুর্য্য অপূর্ব্ব! প্রত্যেকটী কথা দাঁড়িয়ে আছে নিজের সত্যের জোরে! অমামি যতবার পড়ে ততো তার ভাল লাগে। মনেহয় সমালোচনা লিখতে গিয়ে সে বোধহয় শুধু খানিকটা প্রশংসাই করে বসবে, সেটা তার মানস নয়। সমস্ত গুলো বই মন্থন করেও সে তীব্র সমালোচনার কোন কথাই খুজে পায়না, প্রত্যেকটা যুক্তি যেন তারই

অন্তরের প্রতিধ্বনি, যেটাকে অজ্ঞাতভাবে সে হৃদয়ের নিভৃত কোনে হয়ত এতদিন পোষণ করে ছিল!

অমামি ঠিক করলো সে রবিবারে ফের প্রকাশের সঙ্গে দেখা করবে। নারীকে ধরা দেয় কিনা সেটাই সে পরীক্ষা করবে, অমামি পাতবে জাল যে জাল সৃষ্টির আদি উষা থেকে প্রত্যেক নারীকে করেছে মায়াবিনী, যে জালে পথ হারিয়েছে জগতের শ্রেষ্ঠ মহারথীরা। প্রকাশ! অমামির চোখে লালসার তীব্র শিখা জ্বলে ওঠে! স্থির অপলক নেত্র, যেন শিকার ধরার পূর্ব্বে টিকটিকির কাকচক্ষুর অপলক নেত্র! "পুরুষ বেশ্যা দেখেছেন কোথাও?" অমামির কানে কে যেন একশ গ্রামোফোনের চোং দিয়ে কথাটা বলে দেয়! পুরুষ তবে নারী চায় কেন? পুরুষ পুরুষকেই চায় না কেন? ইচ্ছে হয় কথাটা তক্ষুনি প্রকাশকে বলে আসে।

আজ পনের দিন হয়ে গেল সে প্রকাশের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করে ছিল! এই পনের দিন প্রতি মুহূর্ত্ত প্রতি দিন সে প্রকাশের কথা ভেবেছে তার বই পড়েছে, তার যুক্তি মনে মনে ভেঙ্গেছে, পড়েছে, সমর্থন করেছে! প্রকাশের জীবনের শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব সে নারী নিয়ে খেলা করে ধরা দেবে না। প্রত্যেক লেখায়, প্রত্যেক বন্ধুর কাছে, যতো লোক তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে সবাইকে সে এই একই কথা উদ্দাম অহঙ্কারে জানিয়েছে। অমামি করবে এই অহঙ্কার চূর্ণ! এই পনের দিনের প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশের চিন্তায়, তার যুক্তির মানসিক আলোচনায়, তার চেহারার স্মৃতিতে যা ফল আমমির মনে দাঁড়িয়েছে সেটা অমামি নিজে বুঝতে পারেনি, না পারলেও যদি কেউ ভগবান হ'তো সে দেখতো যে অমামি প্রকাশকে সম্পূর্ণ রূপে ভালবেসেছে, শুধু তাই নয় প্রকাশকে তার প্রতি রোমকুপ দান করে সে প্রতিশোধ নেবে, সে প্রতিশোধের জন্য অমামি প্রকাশকে চায়।

তিন মাস পরের কথা। দিন কেটে গেছে, পৃথিবী ঘুরে গেছে

নিজের ক‍ে্য ওপর যেমন ঘুরে আসচে আবহমান কাল থেকে। কোন বৈচিত্র নেই এই পৌনঃ পুনঃ আবর্ত্তের, দু একটী অস্বাভাবিক তরঙ্গ ছাড়া। গড্ডালিকা প্রবাহের সেই চিরন্তনী স্রোত, লক্ষ লক্ষ কুটো ভেসে গেছে—চলেছে! দিন কেটে যাবার কোন ইতিহাস নেই, তার কোন সাহিত্য নেই, তার কোন কবিত্ব নেই। দিন কেটে গেছে কারণ কাটবেই। ওই টুকুই ওর সম্পূর্ণ আয়ত্বকারী ইতিহাস, সাহিত্য বা কবিত্ব! ওটা রূঢ় সত্য! অমামি প্রকাশের ওপর সম্পূর্ণ প্রতিশোধ নিয়েছে অর্থাৎ প্রকাশ করেছে অমামিকে বিয়ে, নিজেকে প্রতারণা করে, বন্ধু বান্ধবকে চমকিত করে, সাহিত্য জগতে অসম্ভব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, অমামির প্রতিশোধের স্পৃহাকে সন্তুষ্ট করে, তার নারীত্বকে অনবগুণ্ঠিত করে, বিদ্রোহী intellectual মায়াবিনী অমামিকে আবহমান কালের স্রোতের একজন সাধারণ "গ্রহণ কর আমায়" নারীতে পরিণত করে। অমামির দিকে যারা অপলক নেত্রে একটা সৃষ্টি ছাড়া ধারণা নিয়ে এতদিন অপেক্ষা করছিল তারা সুস্থির হয়ে চোখের পলক ফেলল। অমামী নারী! নারী ছাড়া নারীর অন্য কিছু হবার চেষ্টা বাতুলতা, তার মায়াবিনীর ওড়না মিথ্যা, সত্য তার দেহ, হৃদয়! গার্ব্বো একদিন ধরা দেবেই!

বিয়ের পর একদিন অমামি ঠাট্টার সুরে বলেছিল "কীগো বিদ্রোহী কবি! তুমি না কোন নারীর কাছে ধরা দেবে না। শুধু তাকে পাবে ছোঁবে না! স্নানও করবে, জলও ছোবে না, "এও কী সম্ভব এভবে"—বিদ্রোহী প্রকাশ এখন কোথায়?" তার সুরে একটু শ্লেষের আমেজ চোখে ছিল তখন লালসার ভাবা! তৃপ্তা অমামি!

"বিদ্রোহী প্রকাশ বিদ্রোহীই আছে—বরং বেশী বিদ্রোহী হয়েছে তোমাকে বিয়ে করে—

অমামি প্রশ্নপূর্ণ চোখে চেয়ে থাকে!

"ঠিক জানি বুঝতে পারোনি—লেখা পড়া শিখে কথাটাকে এমন

অবান্তর মনে করলে। পৃথিবীতে সেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী যার মন প্রাণ দেহ সম্পূর্ণ পরাধীন শুধু একজনের কাছে সে যেই হ'ক! আমার তুমি! বিদ্রোহীর সব গর্ব্ব চূড় হওয়া উচিত একজনের কাছে, তার কথায় উঠবে তার কথায় বসবে! হিটলার, মুসোলিনী, নেপোলিয়ান, বাইরন ঠিক এই রকম বিদ্রোহী, শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী।"

আমি পরাজয় স্বীকার করে! তার স্বামী! তার শ্রেষ্ঠ গর্ব্ব।

বিয়ে হবার পূর্ব্বে দুইজনের একটা সর্ত্ত হয়েছিল! সর্ত্তটা উভয়ের কাছ থেকে নিজস্ব! সর্ত্তটা কী তা বলবার আগে দুজনে পৃথক জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা কী ছিল তার একটু অন্বেষণ করা দরকার! এই সর্ত্তটা সেই পৃথক কামনার সুমধুর সামঞ্জস্য মাত্র।

আশৈশব প্রকাশ অদ্ভুত, অদ্ভুত তার কার্য্য কলাপ, অদ্ভুত তার যুক্তি, বিচিত্র তার জীবন যাত্রার পদ্ধতি সৃষ্টি ছাড়া তার আশা! সংসারে বাপমার মৃত্যুর পর বেশ কিছু টাকা ও মধ্যম গোছের একটা চাকরী নিয়ে প্রকাশ এতদিন কলকাতায় দিন কাটিয়েছে। অভাব হ'ত না কিছুর, আশা ছিল গগনচুম্বী এবং সেটা শুধু তার লেখার যশঃ ও খ্যাতির দিক দিয়ে! কয়েকটা গভীর প্রতিজ্ঞা সে তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে করেছিল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে সে বিয়ে করবে না তবে নারীকে সে চাইবে, প্রতি মুহূর্ত্ত চাইবে! জ্ঞান হবার পর থেকে তার এ চিন্তার কোন মুহূর্ত্তে বিপর্য্যয় ঘটেনি! বাঙ্গালী জীবন নেড়ে চেরে সে দেখেছে যে শতকরা আশীজন একই প্রকার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে—লেখা পড়া শেখা, চাকরী, বিয়ে, ছেলে মেয়ে, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু ও পিছনে পড়ে থাকা জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য ঋণ! তার এটা অসহ্য মনে হতো! ঘূর্ণায়মান সৌরজগতের কক্ষ্য থেকে কী একটা তারা ও সমস্ত নীলিমার গাঢ় নীল বুক চিরে অজ্ঞাত অন্ধকারে আত্মগোপন করতে পারে না? তার সেই মুহূর্ত্তের দেদীপ্যমান রশ্মিতে সমস্ত তারা

গুলো অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে তারদিকে আর ভাববে তাদের মধ্যেও শক্তিশালী, অদ্ভুত কেউ ছিল। প্রকাশ হবে সেই কক্ষ্য চ্যুত আলোকময়। সবচেয়ে ঘৃণা করতো সে সন্তানকে! সে পিতা হবে না! পিতা ত' সকলেই হয়, হবে, হয়েছে! রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভ্রাম্যমান কুকুরও পিতা হয়। পিতা হওয়াই নাকি পুরুষের শ্রেষ্ঠ কামনা! প্রকাশ এটাকে সর্ব্বান্তকরণে অস্বীকার করে। পিতা হওয়া নয়, পিতা হওয়া পদ্ধতিটাই পুত্রের শ্রেষ্ঠ কামনা! ফল নয় কর্ম্ম! সে হবে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, দেশ বিদেশে লোকে তার লেখা পড়ে অপলক চোখে তার স্মৃতির দিকে চেয়ে থাকবে মানসিক পূজা দেবে তার পায়, যুগ যাবে সে আরো মহান্ হবে, তার কীর্ত্তি হবে গগন চুম্বী! সে কীর্ত্তির অংশ তার বংশকে বহন করতে দেবে না, নিজে একা হবে তার সর্ব্বেশ্বর।

প্রথম প্রতিজ্ঞা করবার সময় হয়তো অন্তরীক্ষে দেবতা হেসেছিলেন। তা হাসুন! মানুষ কাজ করবেই, সে সময় সে দেবতার মুখাপেক্ষী হতে পারে না! তা হ'লে জগৎ হ'তো স্থবীর, মানুষ হতো পঙ্গু। দেবতার মুখাপেক্ষী হওয়াকে তাঁরা সব চেয়ে ঘৃণা করেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়াই তার চরমসার্থকতা। ঘূর্ণীয়মান আলোকময় প্রকাশের কক্ষে দেখা দিল আলোক-ময়ী অমামি, দুজন করলো দুজনের মধ্যে আত্মগোপন, দু' হলো এক!

বিখ্যাত ধনী নন্দিনী অমামি! কলকাতার অভিজাত পুরুষ মহলে সে বিখ্যাত। এম্পায়ারে নাচে, চ্যারিটীর দায়ীত্বপূর্ণ ভার নিতে, মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় দু একটা লেখা দিতে, পুরুষ ভক্তদের সঙ্গে রোঁমা রোঁলার ক্রিসটোফার, wells এর ভবিষ্যৎ বাণীথেকে C.S.P.C.A পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ তর্ক করতে সর্ব্বত্র অমামি! কলকাতার সুন্দরীর মেয়েদের নামের তালিকায় অমামি প্রথমেই স্থান পায়। অমামি ঠিক করেছিল বিয়ে সে জীবনে করবে না (যে দিন থেকে সে নিজের মূল্য বুঝতে পেরেছিল) পৃথিবীতে এমন কেউ নেই (সে তাই মনে করতো) যে

অমামিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করতে পারে। গগনস্পর্শী ছিল তার কামনা প্রত্যেকের সঙ্গে সে খেলবে, ছুঁতে কেউ পারবে না। তাঁর ধারণা ছিল বিয়ে করলেই তার রূপ পড়বে চাপা কারণ সেটাত বাঁধা পড়বে একজনের কাছে, কলকাতার খ্যাতি যাবে মরে, বিভিন্ন উপহার ও সুখ্যাতির ডালা আসবে না তার কাছে! জগতে শুধু একজন অমামিকে পূজা করতে পারে না। আয়নার কাছে দাড়িয়ে সে মুগ্ধ হ'তো নিজের চেহারা দেখে! বহুবার বহুসময় সে তার বন্ধুদের কাছে বলেছে তাকে possess করবার লোক পৃথিবীতে (ভারতে) জন্মায়নি। ছায়া জগতের চির উজ্জ্বল অভিনেত্রীদের কথা পড়তো আর তার প্রাণ আরো দীপ্ত হ'য়ে উঠতো। প্রাণের কোণে তার শ্রেষ্ঠ আশা ছিল জগতে একজন স্বনামধন্যা অভিনেত্রী হবার! জগতের সহরে সহরে নগরে নগরে প্রচারিত হবে তার ছবি, অসংখ্য জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে পুরুষ মেয়ের এলবামে তার ছবি স্থানে পাবে, সমাদর পাবে, প্রীতি পাবে কিন্তু সে থাকবে এক, তার প্রতিচ্ছবি হবে বহু, অসংখ্য। তার রূপ, তার দেহ, তার কেশাগ্র থেকে প্রতি রোম কূপের প্রতি ছিল তার সচেতন অহঙ্কার ও অপরিশীম যত্ন। বঙ্কিম ভ্রু থেকে পায়ের রক্তিম নখর পর্য্যন্ত তার সূক্ষ্ম দৃষ্টি! বিচিত্র রূপ রেখা বিমিশ্র বর্ণ লালিত্যের সমাবেশ।

জননী হতে সে শিউরে উঠতো। তার ধারণা ছিল নারীর রূপের, সৌন্দর্য্যের (সৌন্দর্য্য বলতে সে দেহ বুঝতো) শ্রেষ্ঠ প্রতিবন্ধক হচ্ছে তার মাতৃত্ব। তার মাতৃত্বের কাছে তার রূপকে বলিদান দিতে প্রতি মুহূর্ত্তে বিভীষিকা দেখতো। প্রত্যেক নারী মাত্রেই মাতা হতে পারে কিন্তু প্রতি নারীই রূপ পেতে পারে না। মাতা হয় রাস্তার কুকুর, বনের বন্য পশু, আফ্রিকার অসভ্য নিগ্রো জাতি; সুন্দরী সকলে হয় না, হতে পারে না। অমামি দেবী একজন বিখ্যাত সুন্দরী হবে, একজন বিখ্যাত মাতা নয়।

বিয়ে হবার আগে ঠিক এই সর্ত্ত হয়েছিল। তাদের সন্তান হেব না। দুজনেরই সংগোপন কামনার মিলন খেত্র। দুজনেই উৎফুল্ল। প্রকাশ দিল তার ভাবী বিশ্ববিখ্যাত যশ, মান, খ্যাতির অর্দ্ধাংশ অমামিকে, অমামি দিল তার সযত্নে প্রতিপালিত, প্রতি মুহূর্ত্তে সংরক্ষিত রূপ, সৌন্দর্য্য, শ্রেষ্ঠ কামনা, অপরূপ দেহ সম্পূর্ণ ভাবে বিখ্যাত লেখক প্রকাশকে।

১৫ বছর পরের কথা বলছি! ১৫ বছর! অনন্ত অনাদি সময়ের একটী নগণ্য বুদ্‌বুদ হলেও মানুষের জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ অধ্যায়! বাঙ্গালীর জীবনের একটা স্মরণীয় অধ্যায়! এই পনের বছরে পৃথিবীর অনন্ত পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে, যুগান্তকারী ঘটনা, কতক স্বাধীন জাতি পরাধীন হয়েছে, পরাধীন স্বাধীন হয়েছে, রাজা ভিখারী হয়েছে, সামান্য কৃষক তার দেশের সর্ব্বময় অধীশ্বর হয়েছে! ভৌগলিক পরিবর্ত্তন ও হয়েছে অবর্ণনীয়, লোকচক্ষুর সম্মুখে ও অন্তরালে! আকাশ চুম্বী উত্তুঙ্গ পর্ব্বত সহসা তার মস্তক আর একটু উঁচু করে সভ্যতাকে অবজ্ঞা করেছে আর তার চতুঃপার্শ্বের বৃহৎ পৃথিবীকে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, আর ঘটিয়েছে শতাব্দীর সভ্যতাকে বুদ্‌বুদের মতো বিলীন, মানুষের হাহাকার, মুমূর্ষের শেষনিশ্বাসের প্রলয়, ভীষণ, ভীতিপ্রদ ঝড়। কতো দ্বীপ করেছে আত্ম গোপন তার বুকের সভ্যতা নিয়ে, তার বুকের কাঙ্গাল মানুষ নিয়ে নীল অতল সমুদ্রের বুকে! তার বুকের জ্বালা জুড়াল। ঘূর্ণায়মান সৌর জগতের কক্ষ্য হতে কত তারা করলো আত্ম গোপন নীলিমার বুকে, তারায় তারার ঘটলো সংঘর্ষ, অন্যান্য গ্রহ নিমেষের জন্য তারা দিকে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে থেকে নিজের চিরন্তন বিরামহীন পথে ছুটতে লাগল।

এই আবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্ত পৃথিবীকে তার উদ্দেশ্যের দিকে, পূর্ণের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে! মানুষের সভ্যতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চলেছে এগিয়ে, ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, নৈস্বর্গিক, সামাজিক, সমস্ত বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ করে! সে চলেব জগতের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

যা ঘটবার তা ঘটেছে! ওটা আমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নয়! প্রকাশের পরিবর্ত্তন ঘটেছে যথেষ্ঠ! যে পরিবর্ত্তন তার মানসিক, পার্থিব অপার্থিব! শুধু বাংলায় নয় আজ ভারতবর্ষে প্রকাশ একজন বিখ্যাত লেখক। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তার বই অনূদিত হয়েছে আর এনেছে ভারতব্যাপী চাঞ্চল্য, সাহিত্যের একটা যুগান্তকারী নতুন অধ্যায় দেশে দেশে প্রদেশে প্রদেশে হচ্ছে তার সম্বর্দ্ধনা, গলায় দুলেছে বিজয় মালা! বিরোধী দলের ও অভাব নেই তারা প্রকাশের যশকে আরো প্রচারিত করে দিচ্ছে। প্রকাশের আগেকার স্বপ্ন আজ বাস্তব হয়েছে। তার চির দিনের কামনা ছিল সে ভারতের বাইরে হবে বিখ্যাত। দেশে দেশে সমুদ্রের অপর পারে লোকের মুখে মুখে ফিরবে তার নাম, তার সাহিত্যের কথা। এই কামনা তার পূর্ণ হয়েছে। জগতের প্রধান প্রধান সভ্য জাগায় তার বই অনুবাদিত হয়েছে, সেদেশের বিখ্যাত মনীষীরা করেছেন তার প্রশংসা, কাগজে হয়েছে তার সমালোচনা, তার আলোচনা। জগৎ সমস্বরে স্বীকার করেছে যে নানা প্রকার বাধা তর্কের ভেতর দিয়েও যে প্রকাশের অধ্যায় সাহিত্যের এক নতুন সৃষ্টি, এক নতুন অধ্যায়।

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেনী, ইটালীতে প্রকাশ বহু জায়গায় নিমন্ত্রিত হয়েছে সেখানে হয়েছে তার বিপুল সম্বর্দ্ধনা, অবর্ণনীয় অভ্যর্থনা! কাগজে কাগজে বেরিয়েছে তার ছবি, তার বাণী! অসংখ্য লোককে দিয়েছে তার হস্তাক্ষর, জগদ্বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে হয়েছে আলোচনা, পৃথিবীর মুখ্য অধ্যায় নিয়ে, সাহিত্য, ইতিহাস, সভ্যতা! ছবি জগতের যে সব সুন্দরীর ছবি সে যৌবনের প্রারম্ভে অপলক নয়নে চেয়ে দেখেছে তারাই এসেছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার অটোগ্রাফ নিতে! প্রকাশ আশাতীত পেয়েছে আশাতীত হয়েছে।

অমামি? সুখী অমামি। প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি ক্ষেত্রে সে পেয়েছে তার স্বামীর অর্দ্ধ সম্মান, পূর্ণ ভালবাসা! প্রকাশ তাকে আকণ্ঠ তৃপ্তি

দিয়েছে, অমামি সার্থক, পরিতৃপ্ত, সচেতন অহংকারী !

শুধু অন্তর নিয়ে একটা লোক বাঁচতে পারেনা। যৌবনে সাময়িক উত্তেজনায় সে অন্তরকে কাল্পনিক বর্ণে বিমিশ্র বর্ণ সমন্বয় করে তুলে' বাহিরকে করে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা। অন্তরে বাড়া যায় কিন্তু হাঁটা যায়না। বর্দ্ধিষ্ণু লতা যতো দূর সম্ভব বেড়ে উঠ্‌বে অন্তরের সূক্ষ্ম জালে, সীমা অতিক্রম করেই সে খোজে আশ্রয়, যে আশ্রয় সে অন্তরে পায়না, পায় বাহিরে ! মানুষ বিচিত্র জন্তু ! বাহির জগতে তার আধিপত্য বিস্তার করা, অন্তরের সাম্রাজ্যকে বহির্জগতে প্রতিফলিত করা ও এই বহির্জগতে এই অন্তরের ছবির প্রতিমূর্ত্তিও দেখাই তার শ্রেষ্ঠ কামনা। সে বহির্জগতেই বাঁচতে চায়। অন্তরে সাময়িক বাঁচায় আনন্দ আছে কিন্তু তৃপ্তি নাই। বাহিরকে আঁকড়িয়ে সে নিজেকে বাড়াতে চায়, দূরকে আনতে চায় নিজের আয়ত্বে, তাকে চায় বুকে বাঁধতে ! আশৈশব যে সুমহান বিস্তৃত ভারতময় প্রকাশ তার যশ চেয়েছিল এটা তারই সূচীপত্র মাত্র। ভারতব্যাপ্ত যশ পেয়ে সে চাইল জগৎব্যাপ্ত খ্যাতি ! তাতে তার অন্তর ভরল কিন্তু মনুষ্যত্ব তৃপ্ত হ'ল না ! পশুতে ও মানুষে এই খানেই পার্থক্য ! মানুষ চায় তার কীর্ত্তি সৌর জগতের ছন্দময় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশতে, সে চায় তার কীর্ত্তিকে ফেলে যেতে পশ্চাতে ! এটাই তার শ্রেষ্ঠ কামনা !

তাদের যৌবনের মিলনোচ্ছ্বাস এখন স্তিমিত না হ'লেও মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মতো দীপ্ত ছিল না—ছিল আরক্ত ! প্রকাশ তার কামনার শেষ রেশটুকু পরিতৃপ্ত ভাবে পেয়েছে—তবুও তার কী যেন একটা আবশ্যক যেটা সে এতোদিন পায়নি ও চায়নি ! কিংবা অমামির অসাধারণ রূপমাধুর্য্যে সেটা ভূলে ছিল ! মানুষ চায় তার রূপকে, তার দেহকে, তার কীর্ত্তিকে তার পশ্চাতে রেখে যেতে একটা আধারে ! অমামি এখনো প্রকাশের বুকে সফেন উত্তাল তরঙ্গ, সে নিজেকে এখনো ভেঙ্গে চূর করে দেখতে পারিনি যে তার প্রতি অনুপরমানু কোন অপার্থিব জিনিষে গঠিত

নয়। বাইরের রঙ্গীন আমেজটুকু তার এখনো কাটেনি! সে এখনো সচেতন যত্নো দিতো তার রঙ্গিন ভ্রু থেকে রক্তিম নখর পর্য্যন্ত; দেহের প্রতি স্তরে স্তরে ছিল তার সযত্ন দৃষ্টি, প্রতি অনু পরমানু আমূল সে প্রকাশকে দিয়েছে, তৃপ্তি পেয়েছে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যে ও ভাবেনি এর নশ্বরতা! সে তার রূপকে অবিনশ্বর ভেবে তার কোন প্রতিচ্ছায়া রেখে যাবার প্রয়াস পায়নি।

প্রকাশের এ আমেজটুকু কেটে আসছিল! সে সূর্য্যাস্তের রক্তিম রশ্মি দেখতে পাচ্ছিল! এ সূর্য্য অস্ত যাবেই! এই অস্তমিত সূর্য্যের ছবি রাখার কোন প্রয়োজনই করা হয়নি! ভবিষ্যতে সূর্য্যকে লোকে বিস্ময়ান্বিত চোখে দেখবে বটে কিন্তু আজের সূর্য্যের সঠিক দীপ্তি মনে থাকবে না।

মানুষ তার বংশ রেখে যেতে চায় তার পিছনে সেই কোন আদিম যুগ হ'তে! সামান্য মূক পশুও এ বিষয়ে সচেষ্ট! তার কীর্ত্তি ও স্মৃতি রেখে দেবারই এটা অনুষ্ঠান মাত্র! যুগ যুগ ধরে প্রকাশের কীর্ত্তি থেকে যাবে এটা নিঃসন্দেহ কিন্তু অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তার কীর্ত্তি স্তম্ভ দেখাবার আধার নেই! নিজের বীজ ছড়াবার প্রয়াস মানুষের শ্রেষ্ঠ! মুষ্টিমেয় আর্য্য সন্তান কোন শুভ মুহূর্ত্তে ভারতে এক কোন দিয়ে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘোর তমসাবৃত রাতে প্রবেশ করেছিল, আজ প্রতি কোনে কোনে তার অসংখ্য প্রতিচ্ছবি! এ অনুপ্রেরণা আদিম পিতার।

প্রকাশের ইচ্ছা হ'লো তার প্রতিচ্ছবি তার পশ্চাতে রেখে যেতে! সন্তান তার চাই! অমামিকে তার এই ভিক্ষা জানায়! বিনীত ভাবে সে একটী সন্তান ভিক্ষা চায়।

প্রার্থনা শুনে অমামি হেসে ওঠে পনের বছর আগের চঞ্চলা সুন্দরী অমামির মতো—প্রাণ খোলা হাসি, প্রকাশের প্রার্থনাকে না মঞ্জুর

করে! সে হাসির প্রতিধ্বনি ওঠে তার পূর্ণ দেহের প্রতি স্তরে স্তরে, সে হাসির ব্যঙ্গ প্রতিচ্ছবি ওঠে তার মনে, সে হাসির বিষ ঢেলে দেয় প্রকাশের কর্ণকুহরে! প্রকাশ তার যুক্তি অমামিকে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেয়! উত্তরে অমামি প্রকাশের কণ্ঠ জড়িয়ে সুমিষ্ট বালিকার মতো বলে উঠলো!

"পরপারে উত্তারিতে—পা দিয়েছি তরণীতে
আবার আহবান ?"

সহসা কথাটা যেন অমামির হৃদয়ে আঘাত করলো! ক্ষণিকের আঘাত ডুবে গেল অতল তলে।

"কিন্তু পারে দাড়িয়ে বিদায় দেবার যে কেউ রইল না মামি! আমার কীর্ত্তি কে বইবে ?"

"আমার রয়েছে সংসার, আমার রয়েছে বিশ্বলোক!" অমামি প্রকাশের প্রার্থনাকে, যুক্তিকে পুরুষের সাময়িক উত্তেজনা মনে করে খেলা করছিল! এ প্রার্থনার আজ কিছু দিন থেকে, তার মুখে প্রতিচ্ছবি দেখছিল।

তোমার কীর্ত্তি, আমার রূপ বইবার মতো লোক একজন এ পৃথিবীতে জন্মাতে পারে না প্রকাশ—তোমার কীর্ত্তি বইবে সংসারে বিশ্বলোক আমার রূপ প্রত্যেক সুন্দরী! তারা জয়গান গাইবে তোমার কীর্ত্তির আমার রূপের, দেহের।"

প্রকাশ দুঃখিত হয় মনে মনে! রক্তিম সূর্য্যাস্তের ওপর একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণের মেঘকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে দেখে!

"ছিঃ—তুমি দুঃখিত হ'লে—come give me a kiss and take me up!

শান্তিত দুজনার ব্যবধানের সঙ্কুলান হয়।

বাস্তবের দু' পৃষ্ঠা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

ক্ষুদ্র নদীর ধারে ক্ষুদ্রতর গ্রাম !

গ্রামটা যেন ঠিক গল্প জগতের গ্রাম, সুতরাং কাল্পনিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য একে অঙ্গে পৃষ্ঠে ঘিরে আছে, ঠিক সামনে দিয়ে ছুটে চলেছে ছোট্ট নদীটা বর্ষায় সে ফিরে পায় তার বিগত দিনের চতুঃপার্শ্ব প্রসিদ্ধ যৌবন, যে যৌবন এখন হয়ে এসেছে ক্ষীণ, তার স্বচ্ছলতা হয়ে এসেছে বাধাপ্রাপ্ত, তার কাকচক্ষু স্বচ্ছতা হয়েছে মলিন, বুকের তরঙ্গ হয়েছে স্তিমিত, ফেনা গিয়েছে মরে ! এরই সুযোগ নিয়ে তার বুকে আশ্রয় নেয় অজ্ঞাত-জাত সমূল পঙ্কিল কচুরী পানা ! তারা এসে তার বুকে আমূল আশ্রয় গ্রহণ করে' সুধা গ্রহণ করে, তাকে করে দুর্ব্বল, ক্ষীণ, রোগগ্রস্তা ! প্রাণপন যুদ্ধ করে তাদেরকে দূর করবার জন্য, পারে না, যারা তার পূর্ণ যৌবনে তার স্বাদ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে স্পর্শ টুকু পায়নি তারাই আজ নিশ্চল বিশাল। গ্রীষ্মে তারা চরমে পৌছায় ! নিজেও মরে তার শেষ বিন্দু রসটুকু গ্রহণ ক'রে, নদীটাকে করে দেয় কঙ্কাল সার, রেখে দেয় শুধু তার পুরাতন কাঠামটা।

গ্রামটীর অবস্থা ও ঠিক ঐরকম ! হয়তো এক দিন বঙ্কিমী যুগে সে ছিল সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা, তার কুঞ্জের চতুপার্শ্বে গান করতো কোকিল ও দোয়েল, আমের মুকুলের ও বকুল ফুলের গন্ধে আমোদিত ছিল তার

অঙ্গের প্রতি যৌবন পুষ্ট স্তর, নারকেল ও আমের ছায়ায় বসে রাখাল বাঁশী বাজাত আর সে বাঁশী শুনে থম্‌কে দাড়াতো অদূরে ঘাটে গ্রাম্য রাখাল তরুণী যারা আসতো জল নিতে, কলসী বসিয়ে তাদের সুগোল কোমরের ওপর। কলসী ঘাটে রেখে তারা আসতো রাখালের কাছে বাঁশী শুনতে যৌবন দুলিয়ে, পাথর কালো অঙ্গের অগ্নি শিখার মতো লাল পাড় উড়িয়ে! বাঁশী শুনতো, কচি আম কুড়োতো, গ্রাম্য গোপন প্রেমালাপ করতো, যাবার সময় চুমু দিতো, জল নিয়ে চলে যেতো ঘর, যতদূর দৃষ্টি চলে তাকাতে তাকাতে! মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে নদীর তীরে সে প্রেমালাপ এখনো বোধহয় চলে, হয়ত সময়ের দ্রুতগতির জন্য সেটা আবদ্ধ হয়েছে কোন নির্দ্ধারিত গোপন জায়গায়, সেটা হয়েছে গোপন সুতরাং নোংড়া! সে গ্রাম নেই! সে গাছ আছে তার ছায়া নেই! পুকুরের স্থান ঠিক আছে কিন্তু সজল সৌন্দর্য্য গেছে মরে, কোকিল ও গান করে দোয়েলও ডাকে, আমের মুকুল, বকুল ফুলের গন্ধ ও ছড়ায়! ওটা চিরন্তনী! গ্রামের দেহ আছে, সৌন্দর্য্য নেই, রূপ নেই, যৌবন নেই, স্বাস্থ্য নেই।

ম্যালেরিয়া, হিংস্র মানুষ, বন্য পশু, পঙ্কিল পূর্ণ অসংখ্য বন পরিপূর্ণ বিগত যৌবনা গ্রাম! যক্ষ্মাগ্রস্তা তরুণী! নারী সে কিন্তু রমণী নয়!

গ্রামের নাম স্বর্ণপুরী!

নামের সার্থকতা ছিল একদিন বোধহয়!

এই গ্রামেই বাস করেন আমাদের নিস্তারিণী দেবী! জনশ্রুতি বুড়ীর এখনো বেশ কিছু টাকা আছে তাই গ্রামের প্রৌড়রা এখনো বুড়ীকে যেন খাতির করেই চলে! যুবক সম্প্রদায় করে তাকে সকলের বেশী সম্মান! কারণ অন্বেষণ করলে দেখা যায় যে প্রৌড়রা যে জন্য তাকে খাতির করতো সেটা সকলের চোখের অন্তরালে, বুড়ীর টাকার পরিমাণ কী রকমছিল তা তাদের ও জানা ছিল না আমাদেরও সঠিক জানা নেই! জানতো শুধু সেই বুড়ীই! তবে অনুমাণের হেতুছিল যথেষ্ট!

নিস্তারিণী দেবীর স্বামী ছিলেন পুলিসের দারোগা! এই রকম গণ্ড গ্রামে তিনি কী করে দারোগা হলেন তার একটু বিচিত্র ইতিহাস আছে!

সে আজ অনেক দিন আগের কথা! সে সময় আমাদের রাজার সঙ্গে নাকি কোথায় বহুদূরে অন্য রাজার ভীষণ যুদ্ধ বেধেছিল। প্রয়োজন হলো দলে দলে বলিষ্ঠ বাঙ্গালীর! গ্রামে গ্রামে রটে গেল তার বার্ত্তা, সঙ্গে সঙ্গে তার আনুসাঙ্গিক বেতন, সুখ সুবিধা, বর্ত্তমানের লোভ, ভবিষ্যতের সংস্থান। বিধুভূষণ এ লোভ এড়াতে পারলেন না! বলিষ্ঠ? তাঁকে যিনি না দেখেছেন তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন না তাঁর শারীরিক পরাক্রমের কথা তার অঙ্গ সৌষ্ঠবের ইতিহাস! ইতিহাস আজকাল লোকে বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের ধারণা বর্ত্তমান একপা অতীতে দিলেই, সেটা চোখের অন্তরালে গেলেই, সেটা হয় মিথ্যা! ইতিহাস মাত্রেই নাকি হয় মিথ্যা, নয় অতি রঞ্জিত! তবে স্বর্ণপুরী গ্রামের চতুঃপার্শ্বে দু দশ খানা গ্রাম এখনো বিধূ ঠাকুরের পরাক্রমের কথা মাথাপেতে নেয়! তাঁর নাকি ছিল একটা বিরাট দল, যে দল নাকি অমাবস্যার তিমির রাতে করতো কালীপূজা এবং তার পরেই শোনা যেতো দু দশটা ডাকাতি কথা! যাক! ও অনেক কথা! ঠিক এই সময়ই এলো যুদ্ধের বার্ত্তা!

গ্রামে এলেন সদরের হাকিম! সেদিনের ইতিহাস আয়োজন আজোও অনেকের পরিস্কার মনে আছে! ঐ বসুবাবুদের আম বাগানে বসলো এ বিরাট সভা! জড় হ'লো গ্রামের ধনীদরিদ্র জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে। হাকিম শোনালেন রাজার বার্ত্তা তাঁর প্রজাদের কাছে! সাত-সমুদ্র-তের নদীর পার থেকে নাকি স্বয়ং রাজা স্বর্ণপুরীর গ্রামের লোকের কাছে ভিক্ষা ও সাহায্য প্রার্থনা করেছেন! তিনি দেখালেন বিচিত্র বর্ণের ছাপান বিভিন্ন প্রকারের কাগজ! শোনালেন বেতন, অন্নবস্ত্রের সাচ্ছন্দের কথা ভবিষ্যতের সংস্থানের বার্ত্তা, শেষ জীবনের সাহায্যের কথা, স্ত্রী পুত্র পরিবারের রক্ষার অভয় বাণী! এবার্ত্তা শুনল সকলে, রাজার জন্য

সহানুভূতি দেখালো আবালবৃদ্ধবনিতা! ভাবখানা এই রকম যেন সকলেই দিত প্রাণ তাদের রাজার জন্য, কিন্তু প্রত্যেকেরই হঠাৎ বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ছিল! শুনল সকলে, বুঝলো প্রত্যেকে, এগলোনা কেউ!

হঠাৎ একদিন শোনা গেল বিধূ ঠাকুর যাচ্ছেন যুদ্ধে! গ্রামের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, নিস্তারিণী দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে, দুবছরের মেয়ে কমলাকে বুকে চেপে, তাকে চুমু খেয়ে বিধূভূষণ সগর্ব্বে যাত্রা করলো! গ্রামের সকলে ধন্য ধন্য করলো! "হ্যাঁ মরদ বটে!" সে দিনটা স্বর্ণগ্রামে হৈচৈ পড়ে গেল। দলে দলে এলো বিধূকে দেখতে চতুঃপার্শ্বের গ্রামের লোক। সদরের হাকিম স্বয়ং এলেন তার বাড়ীতে! নিস্তারিণী দেবীকে দিলেন অভয় বাণী! বিধূভূষণ চলে গেলো রাজাকে সাহায্য করতে।

নিস্তারিণী দেবী পেতেন মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য! রাত্রে সরকারী চৌকিদার তাকে পাহারা দিতো! মাঝে মাঝে স্বয়ং হাকিম আসতেন তদারক করতে।

বিশ্বব্যাপী সমরানল শান্ত হ'লো! আমাদের রাজার জয় হয়েছিল! বিধূভূষণ যখন আমাদের রাজার সাহায্যের জন্য জয় যাত্রা করেছিল তখনই স্বর্ণপুরী ও চতুঃপার্শ্বের দুদশ খানা গ্রাম তাঁর জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল! সে লাঠি ধরলে দু'শ লোকের সম্মুখীন হ'তে পারতো—জনশ্রুতি ছিল! চার বছর পর বিধূভূষণ ফিরে এসে গ্রাম্য গৃহের অবস্থা উন্নতি ছাড়া অবনতি দেখেন নি। একেই বলে ইংরাজ বাহাদুর! মেসোপোটেমিয়া ফেরৎ বিধূভূষণ তার ঐন্দ্রজালিক বিচিত্র বর্ণে বিমিশ্র সমন্বয়ের গল্পে চতুঃপার্শ্বের গ্রাম দু'দশ দিন বেশ মেতে থাকলো।

তারপর বিধূভূষণ সেই হাকিমেরই কৃপায় হলেন পুলিশের দারোগা। বেতন প্রচুর, পরাক্রম, খ্যাতি অবর্ণনীয়! কিছুদিন পরে এক দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ ডাকাতের দল ধরতে গিয়ে তাদের হাতে বিধূভূষণ প্রাণ হারালেন।

সেই অবধি নিস্তারিণী মাসিক পঁচিশ টাকা করে সরকারের কাছে পেয়ে আসছেন—কমলা পেতো দশ টাকা! সে আজ ছ' সাত বছরের কথা যখন বিধূভূষণ মারা যান।

তাই লোকে অনুমান করছে নিস্তারিণীর বেশ কিছু টাকা আছে, গ্রামের ওপর পঞ্চাশ বিঘা জমি ছাড়া। বিধূভূষণ যুদ্ধ থেকেও এনেছিল বেশ, দারোগা হয়ে ও জমিয়েছে যথেষ্ট! পুলিশের দারোগা—জলের মতো কাঁচা টাকা! ও অখ্যাতি চিরন্তনী!

কমলা বড় হ'লো। অসামান্যা রূপসী সে; বঙ্কিম ভ্রূ থেকে পায়ের রক্তিম নখর পর্য্যন্ত সে অসামান্যা! ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত গ্রামেও সে যেমন স্বাস্থ্য পেয়েছে তাতে বাঙ্গালী দরিদ্র ঘরের মেয়ের মতো শুধু অঙ্গের কোন বিশেষ স্থানে যৌবন দেখা দেয়নি, তার যৌবন দেখা দিয়েছে অঙ্গের প্রতি স্তরে স্তরে, সাড়া দিয়েছে প্রতি রোম কূপে রোম কূপে। এই রূপ এই দেহ সে স্বর্ণফুলীর পরিবর্ত্তে যদি কলের জলে ধুতে পারত, দেহ চর্চ্চার প্রতি দৈনন্দিন দৃষ্টি দিতে পারত তবে কমলাও একজন বিখ্যাত "Society—মেয়ে" হ'তো, সে দিতে পারতো Empire এ তার দেহের প্রতি অঙ্গের তরঙ্গায়িত নৃত্য দোলা, কমলার রূপ সে নিজে বোঝবার আগে বুঝলো তার মা, বুঝলেন আর ত্রস্তা হলেন সে মেয়ের সম্বন্ধে সেই গ্রামে, একা তিনি আর উৎসুক প্রতিবেশী। সবচেয়ে আগে কমলার রূপ বুঝলো গ্রামের যুবকসম্প্রদায়! কমলা নিজেকে এখনো চিনতে পারেনি, বুঝতে পারিনি বালিকা কমলার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে কার স্পর্শ লেগেছে, প্রতি স্তর তার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষনী শক্তি পেয়েছে, তার পাংশু গালে ফুটেছে রক্তিম আভা, সেটা হয়েছে আরো লোভনীয়! কমলা দর্পনে নিজের মুখ দেখতে পায়, দেহ দেখতে পায় না।

চঞ্চলা কমলা! দেহের প্রতি অনুর পরিবর্ত্তন ঘটলেও তার মনের ঘটেনি! সে এখনো বাগানে বাগানে আম কুড়িয়ে বেড়াতে চায়,

বুকের আঁচল খুলে জাম কুড়িয়ে আনে, জামের তীব্র রং লাগে তার বুকের কাপড়ে! নীচু ডালে আম ঝুলতে দেখলে এখনো সে তার পিণ্টু দা, নিলুদাকে ডেকে বলে তাকে উঁচু করে ধরতে তার দু বগলের মধ্যে হাত দিয়ে! সমস্ত সকাল স্বর্ণফুলীতে স্নান করে তার জল বিক্ষোভিত করে, তীরের জল করে কর্দ্দামাক্ত, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার দেয়, ডুব সাঁতার দিয়ে লুকোচুরি খেলে আর জলের নীচে হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে ছেলেদের সঙ্গে তার ছোয়াছুঁয়ি! তারা চোর ধরে জলের নীচে! স্নানের শেষে ভিজে কাপড়েই কমলা অতটা পথ হেঁটে বাড়ী আসে! নিস্তারিণী দেবীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়, দু চক্ষু ওঠে তার রেখাঙ্কিত কপালে।

"ওকীলো—ওকীঢং! এই রকম ভিজে কাপড়ে তুই এতগুলো মরদ ঠেলে বাড়ী এলি! দ্যাখ্, কাল থেকে যদি তুই আমার বিনে হুকুমে নদীতে যাবি; মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেবো কিন্তু—হ্যাঁ! না.নি যদি আমি বামুন ঘরেই জন্মাইনি।

কী একটা চোখে পড়ায় নিস্তারিণী থমকে দাঁড়ায়! তাঁর থামার ভাবটা যেন বজ্রাঘাতের মতো।

"ওঃ মা আমি কোথায় যাবো গো! ওলো ও কমলি তোর গায়ের জামা কই! তুই কি খালি গায়ে ঘাটে গিয়েছিলি—এই সোমত্ত মেয়ে! ও মা মা তোর জ্বালায় কী আমি শেষে গলায় দড়ি দেবো না কি লো! মর মর পোড়ার মুখী আমার হাড় জুড়ুক! একটা কেলেঙ্কারী না করে তুই ছাড়বি না কমলি—এ ঠিক দেখিস।"

কমলা যা উত্তর দেয় তাতে নিস্তারিণী দেবী কয়েকটী ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তারাও একচাপ বিরাট অন্ধকার তাঁর চোখের সম্মুখে দেখেন।

"বা—রেঃ আমি কী করবো! জলের নীচে পিণ্টুদা একটানে আমার বুকের কাছ থেকে জামাটা টেনে ছিড়ে নামিয়ে দিলে! সেই

বারই ত' আমি মোর হয়ে গেলাম! খানিকটা আঁচড়েও দিয়েছে, এই দ্যাখ না।

'সোমত্ত' পনের বছরের মেয়ে কমলা যে স্থান বুকের ওপর দেখায়, তাতে নিস্তারিণী দেবী চোখ বোঁজেন।

"দূর হ'—দূর হ' হতভাগী—কাল থেকে তোর পায়ে বেড়ী না দি যদি—

কী একটা যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কমলা সেটাকে অগ্রাহ্য করে এক দৌড়ে ঘরে ঢোকে! কোথায় থাকে কাপড় কোথায় থাকে অঙ্গ।

" আরসীতে দ্যাখ কত বড়ো হয়েছিস—হতভাগী! কুলে কালী দিবি তুই কমলি—এই দেখেনিস—

সত্যি কমলা আরসীতে তার চেহারা দেখেনি। দেখলে সে হ'তো মুগ্ধ, সে হ'তো সংযমী। সে অবাক হয়ে দেখতো তার যৌবনের প্রতি অঙ্গ সৌষ্ঠব, প্রতিস্তর, প্রতি রোম কূপ, দেখতো আর মুগ্ধ হ'তো! এজিনিস সহজে জগৎকে দেখাবার নয় যখন বুঝতে পারতো, তখন প্রতি স্তর সে আবৃত করতো আর জগতের ঔৎসুক্য দিতো বাড়িয়ে, তিলে তিলে, দিনে দিনে।

কুলে কালি দেবার সুযোগ পায়নি, দু মাসের মধ্যেই নিস্তারিণী দেবী কমলাকে বিয়ে দিলেন এক কলকাতার ছেলের সঙ্গে!

বলা বাহুল্য ছেলে কলকাতার কেরাণী! মাসে আশী টাকা পায়।

কমলা গ্রাম্য মেয়ে। রূপ ও দেহ ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না! সাধারণতঃ গ্রামের মেয়েরা যা হয়, পড়ে অল্প, অথচ জানে বিশ্বব্যাপী! অতি অল্প বয়েসেই জীবনের নিগূঢ় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জেনে পণ্ডিত হয় অর্থাৎ অতি শিগ্‌গিরই অকাল পক্ক হয়! কমলা ও তাই।

নিস্তারিণী দেবী তার যথা সর্ব্বস্ব ও কমলাকে জামাই এর হাতে তুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন! মা ও মেয়ে এখনো গ্রামেই থাকে।

কথা হচ্ছে শিগ্‌গিরই জামাই তাদের নিয়ে যাবে কলকাতায়। সুখ দুঃ স্মৃতি বিজড়িত স্বর্ণপুরী।

কমলা নিজেকে দেখেছে, বুঝেছে যে এ পাবকশিখাকে না বাঁধলে সহস্র শিখা ধারণ করে নিজেকে পোড়াবে, বিশ্বকেও ছাড়খার করবে তাই সে অতল নিংড়ে এতোদিনের সঞ্চিত সম্পূর্ণ সুধা নির্ম্মলকে নিঃশেষ করে দান করছে। তাকে করছে অধীন নিজে পাচ্ছে তৃপ্তি এ জিনিষের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি হচ্ছে দানে।

মানুষ গড়ে বিধাতা ভাঙ্গে!

নিস্তারিণী দেবী আর জামাইএর বাড়ী যেতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি মারা গেলেন; সত্যিই তিনি মারা গেলেন! মৃত্যুর ওপর কারুর হাত নেই, ওটা রূঢ় সত্য। আকস্মিক বা অনাকস্মিক হ'ক ওটা যে কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে কাউকে বিজ্ঞাপন না দিয়ে! বিজ্ঞাপন দেয় না বলেই ওটা সহজ, সুন্দর, শান্ত। মৃত্যুই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু: ও' না থাকলে মানুষ পাগল হ'য়ে যেতো, সময়ে সময়ে মরে বাঁচতে পারতো না।

নির্ম্মল এলো! নিস্তারিণী দেবীর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে কমলাকে নিয়ে চলে আসে কলকাতা! আজন্মস্মৃতি বিজড়িত স্বর্ণপুরী। প্রতি ধূলিকণা এর মিষ্টি, সূচাগ্র ঘাসের প্রতি পাতাটি তার পায়ে ধরে বলে 'যেতে নাহি দিব!' যাবার আগে কমলার মনে পড়লো তার পিণ্টুদার কথা। বালিকা কমলা এতোদিন তার অজ্ঞাতে পিণ্টুর জন্য তার সুধা-ভরা হৃদয়ের এক কোনে একটু স্থান পেতেছিল, সে স্থান ছিল শৈশবের কমনীয় স্থান, যৌবনের আগমনীর সুরে সেটা হলো রক্তিম, নরম, ক্ষত! জোর করে তার অধিকৃত স্থান ঢাকতে গিয়ে তার ওপরে একটা পর্দ্দা পড়লো বটে কিন্তু সেটা মুছে নিশ্চিহ্ন হ'লো না, হতে পারে না। ওটা যে আদি, প্রথম স্তরের প্রতিমূর্ত্তি, ওকে মুছতে হ'লে

প্রাণকে করতে হয় নিষ্প্রাণ, হৃদয়কে করতে হয় উৎপাটন! কমলার বুকের ওপর এখনো সে আচড়ান দাগটা জ্বল জ্বল করছে। অমন স্থানে দাগ এক পিণ্টু ছাড়া আর কেউ কমলাকে দিতে পারে না।

যাবার পূর্ব্বে পিণ্টু এসেছিল দেখা করতে! নিভৃতে হ'লো সাক্ষাৎ কমলার সঙ্গে! অন্তরে অন্তরে সাক্ষাৎ, দেহে দেহে নয়! নিভৃতিতে জেগে ওঠে অন্তরের সুপ্ত গভিরতম প্রদেশের বাণী, যে বাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার মালিকও ছিল অজ্ঞাত! নিভৃতির এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বিশ্বব্যাপী আকর্ষণী শক্তি!

"কমলা যাবার আগে এই প্রথম প্রার্থনা, এতোদিন সাহস করিনি আজ ভিক্ষা চাচ্ছি।"

কী—

বলো দেবে?

দেবার হ'লে দেবো—

একটা চুমু—

তুমি মুক্ষু—এতোদিন চাওনি কেন? শুধু একটা চুমু? সব দিতাম তোমাকে, আমার সব! শুধু দেখতাম তুমি চাও কি না! শুধু একবার মুখের চাওয়া—

এই ত' আজ—

"আজ আর হয় না—একই ফুলে দু দেবতার পূজো হয় না পিণ্টু দা! এখন আমার একটা ভিক্ষা—বলো দেবে?

কী?

আমাকে ভুলে যাও—

তুমিও আমাকে—

"হয় না, দেখোতো চিনতে পারো?" এ দাগ কে দিয়েছিল? কমলা তার বুকের বসন অনাবৃত করে পিণ্টুকে দাগ দেখায়! পিণ্টু ভুলে

যায় নিজেকে, কমলাকে, পৃথিবীকে—! ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত হয় তার প্রতি রোম কূপ! কান পেতে থাকে দেহের প্রতি অনু পরমানু হৃদয়ের যুদ্ধ ঘোষণা শোনার জন্য।

"কমলা"—চিৎকার করে তাকে ধরতে যায়!

"হয়না পিণ্টুদা"—কমলা সশব্দে ঘরের দরজা তার মুখের ওপর বন্ধ করে দেয়।

ছোট বাড়ীতে কমলা কলকাতার সংসার গুছিয়ে নেয়। সংসার করার বিদ্যা নারীকে নতুন করে দেখাতে হয় না, কিংবা কেউ একেবারে মূর্খ হয় না এ বিদ্যায়! এটা অনেকটা জাতীয় আন্তরিক সমস্যা যেটা ক্রমে ক্রমে তারা নিজেই সমাধান করে নেয়। পুতুল খেলা এ সমস্যার শ্রেষ্ঠ ও প্রথম সোপান! গ্রামের মেয়েদের এ বিদ্যায় যথেষ্ট সাহায্য করে তাদের মা, পুতুল খেলা, সঙ্গীরা ও অকাল পক্কতা। কমলা আস্তে আস্তে তার নতুন সংসার গুছিয়ে ফেল্লো! শোবার ঘরে বেশী কিছু জিনিষ রাখলে চলবে না, কিছু কিছু চালান করতে হবে পাশের ঘরটায়! এই খানটায় খাট খানা পাততে হবে, তা'লে বেশ পশ্চিমের রোদটুকু বিকেল বেলায় বিছানায় এসে পড়বে! নির্ম্মলের দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, জুতোর ব্রাশ, কালী, দুজনারই স্নো, ক্রীম, সাবান, কমলার তরল আলতা, চুলের ফিতে, কাঁটা, আয়না প্রভৃতি ঐ দেয়াল আলমারীটায় থাকে! শুধু ভাঙ্গে ও গড়ে! কমলার মনমতই হয় না! বড় আয়না খানা এমন জায়গায় টাঙ্গাতে হবে যাতে শুয়ে শুয়ে দুজনেই মুখ দেখতে পারে।

জলের কুঁজোটা ঐ কোনে রাখতে হবে! উঁহুঃ ও কোনে রাখলে দুদিনেই ভাঙ্গবে! সরিয়ে এই কোনে রাখতে হবে! হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে! কাপড়ের ব্রাকেট খানা এই খানে টাঙ্গাতে হবে! ছোট টেবিল খানা এখানে রাখলে চলবে না ওটাকে নিয়ে রাখতে হবে মাথার

কাছে! ভাড়ার ঘর, রান্না ঘর, বারান্দা, বাথরুম সবই ঠিক ঠাক করা হয়! কমলা দিন রাত ঐ করছে, এটা সরিয়ে ওটা রাখছে, ওটা সরিয়ে এটা রাখছে! শুধু ভাঙ্গছে আর গড়ছে! নির্ম্মল দেখে আর হাসে।

"কী গো পাকা গিন্নিটী, তোমার সংসার গোছানই যে হয় না! কিছু অভাব-টভাব হ'লে একে জানিও" —নির্ম্মল নিজেকে দেখিয়ে দেয়।

"একদিনে কী আর হয়! তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি এর কী বুঝবে! তুমি কাপড় ছাড়ো; ঐ বাথরুমে জল আছে! হাত মুখ ধোও! আমি চা করে আন্‌ছি।"

নির্ম্মল তাকে দেখে অবাক হয়, মুগ্ধ হয়! স্বামীকে এতো যত্নো করতে, এতো ভাল বাসতে নারীকে কে শেখালে।

পাশের বাড়ীর লোকের সঙ্গে কমলার পরিচয় হয় ক্রমে ক্রমে! সুন্দর মেয়েটী ও বাড়ীর! কমলার চেয়ে বয়সে কিছু বেশী হবে! বেশ অমায়িক, ভারী ভাব কমলার সঙ্গে। কমলাও মাঝে মাঝে যায় তার বাড়ীতে বেড়াতে! তাদের বাড়ীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হচ্ছে তার ছেলেটী! যেন এক টুকরো চাঁদ। কমলার অন্তর মন্থন করলে দেখা যেতো যে সে তাদের বাসায় বোধাহয় শুধু খোকার জন্যই যায়—শুধু যায়, প্রতি মুহূর্ত্তে তার যেতে ইচ্ছা করে শুধু খোকাকে একবার কোলে করবার জন্য! দুপুর বেলা তাকে নিয়ে আসে নিজের বাড়ীতে, যতক্ষণ নির্ম্মল অফিস থেকে না ফেরে ততক্ষণ তাকে কাছে রাখে, আদর করে, তাকে নিয়ে যে কী করবে ভেবে পায় না। এটা যেন তার দৈনন্দিন গৃহ কার্য্যের অন্যতম কার্য্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত। সমস্ত দুপুর কমলা খোকাকে যে কী করবে ভেবে পায় না। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে তাকে আদর করতে করতে। বুকের সঙ্গে চেপে ধরে শুয়ে থাকে সমস্ত দুপুর, খোকাও তার বুক আঁকড়ে ধরে কী যেন খোঁজে! তাকে অসম্ভব বিরক্ত করে, কমলা সব চেয়ে সুখী হয় বিরক্ত হতে! দুপুরে খোকা না হ'লে তার চলে না, চলবে না।

খোকার মা'ও বাঁচে তাকে কমলার কাছে পাঠিয়ে,—যে দুষ্টু; তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে হাতের কাজ গুলো সেরে রাখে। আর যাই করুক নির্ম্মল আসার আগেই কমলা ঠিক খোকাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দেয়! কী জানি কেমন লজ্জা করে নির্ম্মলের সামনে খোকাকে আদর করতে।

সেদিন নির্ম্মল কী জানি কেন একটু তাড়াতাড়ি ফিরল বাড়ীতে! কোন বড় কর্ম্মচারীর বিদায় অভিনন্দন দেওয়াতে একটার সময়ই অফিস বন্ধ করতে হয় তার সম্মানার্থে। নির্ম্মল এসে দেখে খাটের ওপর কমলা ঘুমিয়ে আছে, তার বুকের সঙ্গে চেপে রেখেছে খোকাকে! সে ঘুমিয়ে! তার একখানা হাত কমলার ব্লাউজের খোলা বোতামের ভিতরে বুকের এক পাশে চেপে ধরেছে। নির্ম্মল অবাক হয়ে গেল কমলার এই মুর্ত্তি দেখে। যেন মাতা হবার জন্যই তার জন্ম। যুগ যুগ ধরে সে যেন শুধু মাতাই হয়ে এসেছে। কমলা বধূ হবার চেয়ে, প্রিয়ার হবার চেয়ে, মাতা হওয়াই তার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা! নারী বোধহয় এক মুহূর্ত্তের জন্য বধূ হতে চেতো না, এক দিনের জন্যও সে পুরুষের প্রিয়া হতো না, প্রতি মুহূর্ত্তে যদি সে মাতা হবার আশা পোষণ না করতো। পুরুষের সাহায্য ছাড়া যদি সে মাতা হতে পারতো তবে এক মুহূর্ত্তও সে পুরুষের সঙ্গ সহ্য করতো না। কমলার শ্রেষ্ঠ মাতৃ মুর্ত্তি নির্ম্মল দেখল। কমলার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

"ওমাঃ—তুমি আজ এতো সকালে যে—ডাকনি কেন? কী দেখছিলে? খোকাকে? ও বাড়ীর খোকা!"

"কী সুন্দর দেখাছিল তোমাকে কমলা—তুমি যেন ওরই মা! তোমারও দরকার ও রকম একটা খোকা!"

"ধ্যেৎ—দিন দিন তুমি ভারী অসভ্য হচ্ছ! দাঁড়াও আমি ওকে ওর বাড়ীতে পাঠাই! তা না হ'লে জ্বালিয়ে খাবে! যে দুষ্টু!"

"একটা খোকা দরকার"—কথার প্রতিধ্বনি নানা আকার ধারণ

করে' কমলার প্রতি শিরা প্রশিরাটীকে আঘাত করছিল! দরকার! দরকার! বোধ হয় না! কিন্তু দুপুর বেলা সে একা আর কাটাতে পারে না। তাকে কেউ বিরক্ত করলে বড় ভাল লাগে। ঘর গুছিয়ে রাখে ঠিক সেই রকমই থাকে, এ জিনিষ ও জিনিষ নিজের নিজের স্থান পরিবর্ত্তন করে না, কাপড় গুলো ঠিক থাকে আলনায়, ঘরে মেজেতে এক-টুকরোও কাগজ ছেঁড়া থাকে না। বিছানা ঠিক সেই রকমই থাকে বিকেলে পাট করা বিছানাকেই ফের ঝেড়ে পেতে রাখে! এরকম করে' কত দিন চলবে! তার গড়া কাজ কে ভেঙ্গে দেবে! সে কাজ করতে পায় না। দুপুরে সে কী করবে? দরকার! দরকার! সে ঠিক বুঝতে পারে না। কী যেন তার নেই! কোন স্থান যেন শূন্য আছে তার!

পাশের বাড়ীর তারা কলকাতার কোন অন্য অংশে চলে গেল। সে খানে নাকি অল্প ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল বাড়ী পেয়েছে। তা বেশ সুবিধা পেয়েছ ত' যাক্! কিন্তু খোকাকে নিয়ে গেল কেন। যাবার পূর্ব্বে কমলা একদিন ওদের বৌকে বলেছিল—"খোকাকে দিয়ে যাও না আমার কাছে ভাই—কী রে আমার কাছে থাকবি? উত্তরে খোকা কমলার বুকে মুখ রগড়ে দিল, তার বুড়ো আঙ্গুলটা নিজের মুখে পুরে দিয়ে চুষতে থাকে। কমলা খোকাকে আপ্রাণ বুকে চেপে ধরে।

"তা'লে ত' বাঁচি ভাই—আমার হাড় জুড়োয়—রাখ ওটাকে তোমার কাছে! আর ক' দিন। দুদিন পরে নিজের কোলে একটা পেলে আর পরের ছেলে পুছবেও না।

এই শেষের অংশটুকুই যথার্থ উত্তর, পূর্ব্বাংশটুকু ফেনিলোচ্ছ্বাস মাত্র। খোকাকে সে রাখেনা, রাখতে পারে না। কমলা জানে তবুও কেন যে সে তার অদ্ভুত ভিক্ষা জানায়—আশ্চর্য্য!

দুদিন পরে সে নিজে নাকি কোলে পাবে! উঃ সেদিন কী আসবে! কবে? কবে? কবে? কমলা ভাবতে পারে না সে কী আনন্দ।

কমলা তার এই জীবনের বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার ক্ষুদ্র অপরিসর পৃথিবীর প্রতি মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতা থেকে যে সঞ্চয় করেছে তাতে এটাকে সে অপার্থিব মনে করে। মাতা! মাতা! মাতা! তার অন্তর হা হা করে ওঠে। তার ঘন কুঞ্চিত কেশাগ্র থেকে এক বিদ্যুৎ প্রবাহ দেহের প্রতি রোম কূপটীকে জাগরিত বিস্ফারিত করে দিয়ে পায়ের সুন্দর রক্তিম নখর পর্য্যন্ত ছুটে চলে যায়। দেহের আবৃত সুকোমল লাজুক প্রতি অংশটী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

খোকারা চলে যাবার পর কমলার হ'লো সবচেয়ে কষ্ট। দুপুরে সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না। ছট্‌ফট্‌ করে! এটা ঝাড়ে, ওটা পুনরায় সাজিয়ে রাখে, আলনার কাপড়গুলো সব ফেলে দিয়ে আবার কুঁচিয়ে রাখে। Wall আলমারীটা ঝাড়ে, প্রত্যেক থাকে খবরের কাগজ পাতে, জিনিষ গুলো ফের গুছিয়ে রাখে! বিছানাটা তু'লে ফেলে' মনমতো করে পেতে রাখে। এটার জায়গায় ওটা রাখে, ওটা সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখে—তবুও যে সময় কাটে না! এ সব কাজ ও' একঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যায়। তারপর সে কী করবে? নিরূপায় হয়ে ছাদে যায়। নীচে ব্যস্ত বিরাট মহানগরী। ওর প্রতি ধূলিকণা যেন ছুট্‌ছে তার কাজ নিয়ে। এতো কী কাজ! কমলা ভাবে এই যে এতো যান বাহন এরা কী প্রত্যেকেই প্রতি মুহূর্ত্ত এতো কাজ পায়; এত ব্যস্ততা কিসের এদের। বিরামহীন স্রোত সেই উষা থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত অবিরাম ছুট্‌ছে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে উদ্দেশ্যহীন ভাবে। রাতেও কী এদের বিশ্রামহীন ভাবে ছুটতে হবে। ওই যে একটা ভিখারী—আহা বেচারা বোধ হয় অন্ধ, ওর হাত ধরে নিয়ে চলেছে একটা ছেলে। ওদের মুখে দারিদ্রের কঠোর শাস্তির চিহ্ন। ভিখারীটা অবিশ্রান্ত স্রোতের দিকে হাত পেতে সকরুণ সুরে একটা পয়সার জন্য অজ্ঞাত রাস্তার লোককে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে তার মঙ্গলের

জন্য। ছেলেটা ওরই! কেউ ত' কেড়ে নিয়ে যেতে পারে না। বিরাম-হীন স্রোতে একটা লোকও তার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। ওদের সর্ব্বাঙ্গ শত ছিন্ন বস্ত্রে অনাবৃত, যতো না জীর্ণ ততোধিক মলিন। ছেলেটীর মুখখানা শুকিয়ে এত্তোটুকু হয়ে গিয়েছে, এ বেলা বোধ হয় কিছুই খায়নি। পিতার চিৎকারে সে ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু একটী পয়সার জন্য চলারপথের প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করছে। ছেলেটীর শীর্ণ হাত তার জীর্ণ দেহ থেকে প্রসারিত হ'য়ে অবিরাম স্রোতের মুখে একটী কুটোও ধরতে পারলো না। ওর কী মা নেই!——ঐ আর একজন মেয়েলোক। ফুটপাতে ছেড়া একখানা চট পেতে বসে আছে। সেও রয়েছে স্রোতের মুখে হাত পেতে। বয়স ত' ওর বেশী হয়নি, বোধ হয় কমলারই বয়সী। শত ছিন্ন বস্ত্র দিয়ে তার উদ্বেলিত যৌবন আবৃত করতে তটস্থা, ত্রস্তা। ভগবান, যাদের পরিধানে বস্ত্র দাওনি তাদের যৌবন দিয়েছ কেন? তাদের যৌবন আনে শুধু তাদের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে অগণন বিপদ, নির্য্যাতন বন্য পুরুষের হাতে। একি পরিহাস তোমার। সৃষ্টির একী রহস্য দয়াময়। ওর মুখখানি কী। চমৎকার। দারিদ্রকে উপেক্ষা করে ওর যৌবন দেহকে পুষ্ট রেখে তার অঙ্গ সৌষ্ঠব করেছে চমৎকার। কালো কালো কী সুন্দর হাত দুখানা। ওর কোলে একটা ছেলে না? হ্যাঁ তাইত। শুধু পা দুখানা আর পেটটা দেখা যাচ্ছে। মুখখানাকে তার শত ছিন্ন আঁচল দিয়ে ঢেকে আছে, কী করছে? বোধ হয় দুধ খাওয়াছে। কমলার প্রতি রোম কূপে শিহরণ জাগে! ওর ছেলে! ওর ছেলে! মেয়েটার দিকে সকলেই তাকায়, সাহায্য এক পয়সাও করে না। একটা বেঁটে মতো মুসলমান, বিশ্রী দেখতে, কদর্য্য ভাব ভঙ্গি, তার সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় হাতের ছড়িটা দিয়ে মেয়েটার বুকে একটা খোঁচা দিয়ে কী যেন বললো। কমলা শিউড়ে ওঠে। তাকে সে সাহায্য করবে। হঠাৎ

সে দেখে পাশের বাড়ীর জানালা থেকে একটা যুবক অনিমেষ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। ছিঃ ছিঃ! সমস্তক্ষণ হয়তো তাকেই দেখছিল। তাড়াতাড়ি নেমে যায় সিড়ি দিয়ে—ব্যস্ততায় এক রাশ চুল যায় খুলে, আঁচল যায় উড়ে।

নীচে নেমে এসে ঝিকে দিয়ে সে মেয়েটাকে ডাকায়! তাকে দেয় একখানা সাড়ী, একটা সেমিজ। তখনই তার সামনে পড়তে বলে।

"আর কখনো ছেঁড়া কাপড়ে, খালি গায়ে ভিক্ষা করতে এসো না বুঝলে? রাস্তায় কখনো খালি গায়ে আসতে আছে?"

"কী করবো মা—গরীব লোক! কোথায় পাবো জামা! দুটো ভিক্ষে করে তবে খাই।"

"এইতো জামা দিলাম—ছিঁড়ে গলে ফের দেবো!—বুঝলে? আর এই একটা টাকা নাও তোমার ছেলেকে একটা জামা কিনে দিও—বুঝলে, খেয়ে ফেলো না যেন! খাবার জন্য এই টাকাটা নাও। ছেলেকে জামা পরিয়ে কাল দেখিয়ে নিয়ে যেও—বুঝলে।"

—মেয়েটা দু হাতে তাকে ঈশ্বরের মঙ্গল কুড়িয়ে দিয়ে গেল। কলকাতার রাস্তায় অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন ডেকে ত' ভিখারীদের ইতিহাসে কেউ দান করেনি। মেয়েটা কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কলকাতায় এমন মেয়ে কোত্থেকে এলো। সমস্ত দিন হাত পেতে সে অবিরাম বিরাট জনস্রোতের কাছ থেকে কোন দিন দু পয়সা কোন দিন চার পয়সা পেয়েছে আর পেয়েছে অশেষ অবর্ণনীয় নির্য্যাতন ও অপমান! এই ত' একটু আগে—এই ত' কাল গলিটার মধ্যে সেই বিশ্রী লোকটা—ভিখারিণীর মান সম্ভ্রম নেই! ও তার গা সওয়া হয়ে গেছে।

কমলা শুধু জিজ্ঞাসা করে ছেলেটার কথা—কবে হ'লো, কী নাম, তার আর ছেলে আছে কি না, কী খায় ছেলেটা—যত কথা ঐ ছেলেটা-কেই কেন্দ্র করে। তার স্বামীর বিষয় এক বর্ণও জিজ্ঞাসা করলো না।

পরদিন ভিখারিণী আর আসেনি, ছেলেটাকেও আনেনি। কমলার পুনরায় পুরোণ স্রোত। দুপুর আর কাটে না।

কমলা নির্ম্মলকে বলে' অনেকগুলো পুতুল, খেলনা এনে wall-আলমারীতে সাজিয়ে রেখেছিল, ওটা তার শৈশব থেকেই সখ। নির্ম্মল রোজ ফিরতি মুখে তার জন্য খেলনা আর পুতুল কিনে আনতো। সেদিন রববারে কমলা নির্ম্মলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কিনে এনেছে মস্ত বড় একটা ডল। ওটা কমলার শ্রেষ্ঠ সখ ছিল সেই স্বর্ণপুরীর শৈশব কাল থেকে। নতুন সংসার পেতে কাজের চাপে প্রথম প্রথম মনে ছিল না। কাল ওটা কিনে আনল।

বুধবার! সরকারী উচ্চ পদের কোন একজন গন্যমান্য ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলার ও কলকাতায় সমস্ত অফিস বন্ধ রেখে তাঁর স্বর্গগত আত্মার প্রতি সম্মান দেখান হয়। ঠিক বারটার সময় এই দুঃসংবাদ প্রচারিত হ'লো আর সঙ্গে সঙ্গে সব অফিস বন্ধ। নির্ম্মল একটার সময় বাসায় ফিরল।

ঘরে ঢুকে দেখে কমলা শুয়ে আছে; একরাশ কাল চুল তার বিছানাময় ছড়ান। আঁচল লুটিয়ে আছে পায়ের কাছে। সে সেই বড় মোমের ডলটাকে তার অনাবৃত বুকে গভীর ভাবে চেপে সুখে ঘুমুচ্ছে। স্নেহসিক্ত মাতৃ বক্ষে আপ্রাণ নিবিড় আলিঙ্গন।

কমলা কী স্বপ্ন দেখছিল কে জানে।

প্রাণেশের একপাতা—



প্রাণেশের জীবনটা এক অদ্ভুত রকমের। খাপছাড়া সে ছোটবেলা থেকেই, একগুঁয়ে সে শৈশব থেকেই, একটু প্রেমিক সে যৌবনের প্রথম প্রারম্ভ থেকেই। অদ্ভুত তার অভিরুচি, বিশিষ্ট তার কার্য্যকলাপ, অতীত যুগের দৃষ্টিকটু তার ব্যবহার! এ রকমের সে ছোটবেলা থেকেই! বাধা না পেয়ে ধরাটাকে সরা জ্ঞান না করলেও একটা রঙ্গীন মদের পেয়ালা মনে করেছিল।

বিহারের এক স্বাস্থ্যকর স্থানে তার বাবা ছিলেন নামজাদা উকিল। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তার আনুসাঙ্গিক অর্থাৎ বাড়ী গাড়ী প্রভৃতির কোন ত্রুটী ছিল না। তখন ভারতে এ রকম ভাতমারা ব্যাপার স্থরু হয়নি তাই সিতেশ বাবুর ছিল নানা কোম্পানিতে লাইফ্ ইন্‌সিওর, ইম্পিরিয়ালে কয়েক সংখ্যার অঙ্কের চিহ্ন, বাড়ীতে গিন্নী ও একই ছেলে প্রাণেশ।— নামটার সার্থকতা ঐ খানেই। শেষ বয়সের ভিত্তি করেছিলেন তাঁরই কর্ম্মক্ষেত্রে এক বিরাট জমিদারি ফাঁদিয়ে।

ছোট্ট প্রাণেশ। স্কুলে সে পড়বে না। বাড়ীতে মাষ্টার এসে পড়াতে বসে, প্রাণেশের পাটিগণিত, Child reader, সরল পাঠের মধ্যে থাকে দু একখানা বিলিতি ম্যাগাজিন, দু একখানা ছবিজগতের পত্রিকা! পাতায়

পাতায় ছবি—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী অপ্সরীদের। প্রাণেশ একে একে ছবিগুলো মাষ্টারকে দেখায়, 'কেমন এরা দেখতে স্যার' প্রশ্ন করে, তাঁর পছন্দ কোন জনকে তা জেনে নিতে চায়। মাষ্টারের ভ্রূ একটু কুঁচকে ওঠে, বৃদ্ধের চক্ষু কপালে ওঠে যখন প্রাণেশ তার বাছাই মেয়েটার ছবিকে চুমু খায়। ছেলেমানুষী চুমু, হলিউডের সে নটী তথন হয়তো একটুও টলে না, কিন্তু প্রাণেশের চক্ষু সার্থকতায় বুঁজে আসে। বৃদ্ধ মাষ্টার তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখেন—কিন্তু বৃদ্ধদের দেখার ক্ষমতা অনেক কম।

বাড়ীতে সে কোনদিন চাঁদ পেড়ে দেবার আব্দার করেছিল কি না জানি না তবে যা চেতো তাই পেতো তক্ষুণি। প্রাণেশের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল "লজেন্স"। পৃথিবীতে বোধ হয় সবচেয়ে সে এই জিনিসটাকেই ভালবাসতো হয়তো ছবির মেমের চেয়েও তার কারণ সে তার সবচেয়ে প্রিয় মেমকে লজেন্স খাওয়াতো অর্থাৎ মুখে ঘষে তার আকৃতিকে বিকৃত করতো—চুমু খেয়ে দেখতো সে ঠোঁট মিষ্টি! ছুটে যায় মার কাছে—"মা দেখো মেমের ঠোঁট কী মিষ্টি! দেখো না!—"মাকে আব্দার রাখতেই হয়। তার (প্রাণেশের)ঠোঁটে চুমু খেয়ে মা বলেন—"তোর ঠোঁট সবচেয়ে মিষ্টিরে খোকা মেমের চেয়েও।" সে কথা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। লজেন্স তার কী জানি কেন সব চেয়ে ভাল লাগতো। তার পকেট থেকে সেই জন্যই লক্ষ কোটী পিঁপড়ে পাওয়া যেতো সর্ব্বদা। ভাবতো—বড় হয়ে সব টাকা দিয়ে শুধু লজেন্সই কিনবে—একটা দোকান করবে ঐ বড়ো দোকানটার মতো, রাখবে তাতে শুধু কৌটো কৌটো লজেন্স। বাবা কেন টাকা দিয়ে লজেন্স কেনে না তাই ভাবে আশ্চর্য্য হ'য়ে—মনে মনে বাবাকে বোকা বলে!

এই প্রাণেশ বড়ো হয়। লজেন্স খাওয়া ঘোচে নাই বরং বেড়েই চলেচে দিন দিন, মার কাছ থেকে পয়সা পায়, পর্য্যাপ্ত লজেন্স কেনে, নিজে প্রতি মুহূর্ত্তে খায়, ফিফ্‌থ ক্লাশের সব ছেলেকে খাওয়ায়! ছেলে গুলোকে

খাওয়ান তার একটা নেশা! কে কী ভালবাসে তাই দেখা তার ইচ্ছা, কতো খেতে পারে জানতে চায়। আশ্চর্য্য হয় দেখে, যে দুনিয়ার সমস্ত লোক লজেন্স ভালবাসে না! শৈশব তাকে কাণে কাণে বিদায় বাণী শোনাতে চায়!

হাফ্ প্যাণ্ট ছেড়ে কাপড় ধরে। প্রাণের মধ্যে অনুভূতি আসে। ছোট এক তরুলতার চারা যে অনুভূতিতে, প্রাণের সাড়াতে আঁকুপাঁকু করে' তার কচি কচি কোঁকড়ান আগাগুলো উঁচুদিকে ছুড়ে' দ্যায়, কী যেন ধরতে চায় শূণ্যে। সেই অনুভূতিতেই সে জড়িয়ে ধরে তার আশ্রয়কে। মাটী থেকে ওঠে শূণ্যে, শূণ্য থেকে ওঠে তার আশ্রয়ের শীর্ষস্থানে, তবুও মেটে না তার ব্যাগ্রতা, উঁচুদিকে তবুও হাত পা ছোড়ে। এই প্রাণ আসে প্রাণেশের প্রাণে! মেমের ছবিগুলো তার চোখে অন্য রংএর দেখায়। এখনো সেগুলোকে চুমুখায় তবে লুকিয়ে তার পড়ার ঘরে। স্পর্শের স্থায়ীত্ব কিছুক্ষণ বেড়ে যায়—প্রাণে একটা কী রকম যেন ধাক্কা লাগে তার অজ্ঞাতে। তবে লজেন্স তাকে আর খাওয়ায় না। বিনা লজেন্সেই বোধ হয় তার ঠোঁট মিষ্টি লাগে। রবিঠাকুরের কবিতা পড়তে শিখেচে। তাঁর জীবনী শুনে সে বিস্মিত হয়নি—হিংসা হয়। উঃ এতো নাম! জগতে সকলেই নাকি তাকে চেনে! সেও হবে এতো বড়ো, তারও নাম জানবে ভারতবর্ষের সকলে। পড়তে বসে চুপি চুপি সে দু একটা কবিতা লিখতে চেষ্টা করে। কেটেকুটে কয়েক লাইন লিখেও ফেলে। যেমন ধরুণ—

"একদা এক মানুষ
উড়িয়েছিল' ফানুষ
উঠে অনেক দূরে
ফাঁট্‌লো ফটাস্ করে"

এই রকম প্রাণ নিয়ে, উৎসাহ নিয়ে, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, খাপছাড়া এক স্বভাব নিয়ে, সে হয় বড়ো। সে করবে ঠিক তার উল্‌টো যা করবে লোকে

দশজনে, সমাজ সংস্কার সে মানবেতো নাই বরং দু চার কথা শুনিয়ে দেবে যারা মেনে চলে তাদের—হোক না তারা বৃদ্ধ! পাড়ার মেয়েদের সে একটা হিংসার বস্তু (কারণ সুন্দর বলে)। গুচ্ছের ফুটফুটে মেয়ে তাকে সর্ব্বদা ঘিরে থাকে, চেষ্টা করে তার আদর অন্যের চেয়ে বেশীকরে পাবার জন্য। প্রাণেশের সবচেয়ে মজা লাগে যখন কোন মেয়ে মুখ ভার করে অন্য মেয়েকে আদর করতে দেখে। যাকে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতো তাকে বেশী করে রাগাতো অন্য মেয়েকে আদর করে। আদর করা তার অদ্ভূত রকমের! একটা লম্বাগোছের লজেন্সের একদিকটা ধরতো সে কামরে আর একদিকটা দিতো তাকে কামড়ে ধরতে। ঠিক মাঝথেকে দুজনাই একসঙ্গে কামড়ে ভেঙ্গে নিতো। সবচেয়ে সে ভালবাসতো নমামিকে অর্থাৎ নমিকে। ফুট্ফুটে মেয়ে যেন একটুক্‌রো জ্যোস্না! ছোটবেলা থেকেই তাকে সবচেয়ে বেশী রাগাত মানে সবচেয়ে বেশী ভালবাস্‌তো। একদিনের একটা ছোট্ট ঘটনা বেশ মনে পড়ে তার! সকাল থেকেই সে নমিকে চটিয়ে আস্‌ছিল। বিকেল বেলা সে ডাক্‌লো আন্নাকালীকে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী কুৎসিৎ মেয়েটাকে ঠিক নমির সামনে। একটা লজেন্স নিয়ে তাকে তার প্রথাতে আদর করলে। হঠাৎ সেদিন দেখে ফেল্লো আন্নার মা। দুজনার অত কাছাকাছি মুখ দেখে ধরে নিলেন অন্যরকম, ব্যবধান ছোট্ট লজেন্সটা তাঁর চোখে পড়লো না বলেই ঘটলো অনর্থ। আন্নার ভবিষ্যতে প্রাণেশের সঙ্গে মেশা বন্ধ হয়ে গেল! ও ছেলে নাকি বড়ো হ'লে কেলেঙ্কারী ছেলে হবে। যাই হোক্। কিন্তু এধারে নমির ফুল্লো ঠোঁট—দশ বছরের কালমেঘে এলো টল্ টলে জল! ছুটে চলে এলো বাড়ীতে—দুদিন দেখা করে না! প্রাণেশের বেশ লাগে। তৃতীয় দিনে সে ছুতো করে' ঢোকে প্রাণেশের ঘরে, দেখে প্রাণেশ ছবির বই খুলে গুচ্ছের টুকটুকে মুখের মধ্যে তন্ময়! শব্দ করে সে ঘরে ঢোকে কিন্তু প্রাণেশ ভুলেগেছে নিজেকে। "মাসিমা—মাসিমা! কই এ ঘরে

তো নেই তিনি—" নমি এবার প্রাণেশের ধ্যান ভাঙ্গায়। তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে—অর্থপূর্ণ হাসি।

"আমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছ বুঝি ?"

"আমার দায় পড়েছে—আমিতো মাসীমাকে খুঁজছি"

"মাকে ? মা আমার এই টেবিলের নীচে লুকিয়ে রয়েছেন" নমি বোঝে যে সেটা অসম্ভব তবুও আসে তার টেবিলের নীচে উঁকি দিতে, খপ্ করে চেপে ধরে তার একখানা হাত প্রাণেশ তার দুহাত দিয়ে।

"ছাড়ো ছাড়ো—আর বেশী আল্লাদে কাজ নেই"

"আচ্ছা আর আমি আন্নাকে আদর করবো না—হলো তো! আচ্ছা দেখতো কোন মুখটা সব চেয়ে ভাল!"

একপাল মুখ! নমি একটা বেছে নেয়! প্রাণেশের মতে হয় আর একটা।

"দেখতো কেমন, তোমারটার চেয়ে অনেক ভাল—কেমন সুন্দর!"

"মন্দ নয়"

"মাত্র! তোমার মুখের চেয়ে অনেক ভাল—"

আবার ঠোঁট কাঁপে! সন্ধি হয় অদ্ভুতভাবে লজেন্স খেয়ে!

প্রাণেশ ম্যাট্রিক পাশ করে! প্রাণ বেড়ে যায়, আকাশ আরো ব্যপ্ত হয়, পৃথিবী অরো সুন্দর হয়, লজেন্স খাওয়া একটুও কমে না। মনে মনে তার যৌবনের অদ্ভুত তথ্য জাগে, পূর্ব্ব বা পর লোকে অবিশ্বাস দৃঢ় হয়, এ জীবনটা আরও রঙ্গিন ও রসপূর্ণ বোধ হয়। স্থায়িত্ব এর অল্প সুতরাং অতি শীঘ্র একে পান করা উচিত আকণ্ঠ ভরে। একটা বিদ্রোহভাব জাগে মনে মনে। এর ইন্ধন যোগায় তার অস্পষ্টবোধ বাইরণ, ব্রাউনিং, হুইট্‌ম্যানের কবিতার রসে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখে, বাইরণে স্বপ্নদেখে-গড়ে ওঠে।

পড়তে এলো কলকাতায়! বিরাট ক্ষেত্র! বর্দ্ধিষ্ণু লতা পেলো

বিরাট এক আশ্রয়! দুবছরে পাশ করলো I.Sc. ঢুকলো ডাক্তারী লাইনে। এই শাস্ত্রটার ওপর বরাবরই তার একটা অসীম টান। কেমন জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। কতো কাটাকুটি, দেহের ভেতরের সবগুলো শিরা উপশিরা, প্রত্যেক কলকব্জাগুলো সে নেড়েচেড়ে দেখতে পাবে। ছোটবেলা দেখতো ডাক্তার আসতো তার বাড়ীতে, রুগীকে যা ইচ্ছা তাই খেতে দিতো—যা ইচ্ছে তাই লিখে দিতো ওষুধের প্রেক্সিপ্সানে। কী অবাধ স্বাধীনতা! তখন তার মনে মনে জাগতো এই প্রবল বাসনা, অমনি বড়ো হবে, ওমনি যা ইচ্ছে তাই লিখে দেবে ওষুধের প্রেক্সিপ্সানে। মনে মনে ভাবতো বড় হয়ে যখন সে ডাক্তার হবে একজনকে নিশ্চয়ই বিষ মিশিয়ে দেবে তার ওষুধে, কেমন কতোখানি বিশ্বাসের সঙ্গে খাবে তার বিষ! এতেগুলো জীবন নিয়ে খেলা! বেশ! উঃ মৃত্যু দেখতে সবচেয়ে ভাল লাগতো তার! তার ঠাকুমাকে মরতে সে দেখেছে! কেমন চমৎকার ভাবে প্রাণটা বেরিয়ে যায়! কী যুদ্ধই করে দেহটা তাকে আটকে রাখার জন্য, পারে না যখন কী সুন্দর শান্ত হয় তখন! যেন ঠিক চোখবোজা একটা মোমের পুতুল! সবচেয়ে তার ভাল লাগতো ঐ যুদ্ধটা দেখতে, হাত পাগুলো খিচুচ্ছে, মুখখানা বেঁকে বেঁকে কেঁপে ওঠে, সাবানের ফেনার মতো ফেনা মুখবেয়ে পড়ে, বুকটা এক একবার উঁচু হয় একটা মাটির টিপির মতো (কতকগুলো গাছের শিকড় নিয়ে,) আবার নীচু হয়ে যায়! যেখানে যে কেউ মরতো সে যেতো তা দেখতে, বাধা দিতো মা বাপ্! তাই সে ডাক্তারী পড়বে, কতো মৃত্যু দেখবে চোখের ওপর!

এই ডাক্তারী পড়তে পড়তে মারা গেল বাবা! যে বাবা রেখে যায় দু চারটা মোটা লাইফ্ ইন্সিওর, ইম্পিরিয়ালে কিছু মোটা সংখ্যা, ছোটখাট বেশ গোছাল জমিদারি, হাল ফ্যাসানে সাজান একটা বাড়ী, আগত ভাই বোনের কোঠায় শূন্য, সে বাপ মরা অভিশাপ নয়

আশীর্ব্বাদ। তার মতে বড়লোক বাপগুলোর তাড়াতাড়ি খসে পড়া উচিত। অন্ততঃপক্ষে যারা লেখক নয় তাদের। লেখক মরলে দেশের অনেক অপকার হ'তো! এই রবিবাবু যদি তাড়াতাড়ি মরতেন তবে এতো লিখতো কে? এদের বেঁচে থাকা উচিত অনেক দিন। বাইরণ কেন অতো তাড়াতাড়ি মরলো তাই সে ভেবে আশ্চর্য্য হয়।

স্বামীর শোকে নাকি মাও মারা যায় মাস দশেক পরে। গল্প নয়, সত্যিই তাই। বাস্! প্রাণেশের প্রাণ ফুলে ওঠে আনন্দে! (অবশ্য কিছুদিন পর) অবাধ স্বাধীনতা! যতো-ইচ্ছা লজেন্স খাবে, খাতা খাতা কবিতা লিখবে, যা ইচ্ছে তাই কাজ করবে। বাধা নাই, মায়া নাই, পিছু টান নাই! অদ্ভুত ছেলে! পাড়ার লোকে ভবিষ্যৎবাণী করলো নানা প্রকারের! "এইবার গেল ছোঁড়াটা" দুদিনেই দেবে সব ধসিয়ে" ইত্যাদি! মেয়েদের ওপর পড়লো কঠিন বন্ধন! শুধু নমামির মা তার মার শূণ্য আসন পূর্ণ করে রইলেন, তারা বাবাও স্নেহ করতেন বাস্তবিকই! এরা দুজন চিরদিন একে ভালবাসে! উদ্দেশ্য আছে বোধ হয় কিছু! কী জানি! আর নমি! প্রাণেশ তাকে আরো বেশী করে রাগায় অর্থাৎ বেশী ভালবাসে! চুপি চুপি এখনো লজেন্স ভাগাভাগি করে খায়; কুট্ করে মাঝখানে লজেন্সটাকে কেটে নিয়ে, চুক্ করে একটা শব্দ করে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পিঁপড়ে শুদ্ধ কতকগুলো লজেন্স চুপি চুপি এসে চটকরে ফেলে দেয় তার ব্লাউজের ভিতরে। তারা ব্যস্ততা দেখে আনন্দ পায়।

প্রাণেশ ডাক্তারী পাশ করে' এসে দেশেই বসে। বসে অর্থাৎ কবিতা আর গল্প লেখে পুরো দমে। পেছনে থাকে ডাক্তারী যন্ত্র সামনে থাকে কবিতা ও গল্পের খাতা, পারকার পেন, দু চারটা কালী, গুচ্ছের ইংরাজী বাংলা পত্রিকা! কোন ডাক্তারী কল আসলে জিজ্ঞাসা করে—"মরতে কতো দেরী?" অদ্ভুত প্রশ্ন! শুধু নাকি মৃত্যুমুখি রুগীই দেখবে অর্থাৎ মৃত্যু দেখবে।

পাঁচ বছর সে এখানেই ডাক্তারী করে। তিন বছর হ'লো নমির বিয়ে হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে সে লেখক বলে' বেশ একটু নামও করেছে। প্রথম প্রথম শুধু সে লেখা পাঠাতো অমনোনীত হলে ফেরৎ আসার জন্য। বাংলা দেশের সম্পাদকগুলির ওপর হ'তো অসম্ভব রাগ, বাছাই-এর ক্ষমতা তাদের একেবারে নাই বল্লেই হয়। তারা যা লেখা ফেরৎ পাঠাতো তার চেয়ে কতো রাবিশ বেরিয়ে যেতো ছাপার অক্ষরে। ঐ যে কতকগুলো একচেটিয়া করেছে তারা ছাড়া যেন আর কেউ লিখতেই পারে না, আশ্চর্য্য! ক্রমে ক্রমে তার ধৈর্য্যের ফল মিল্‌লো। বেশ একটু নাম করলো লেখক বলে'। সঙ্গে সঙ্গে দেশ হ'য়ে উঠ্‌লো ছোট, অপরিসর-রুদ্ধ। চলে এলো কলকাতায় একটু আশ্চর্য্য রকমের ঝাঁকুনি দিয়ে। সকলেরই লাগলো একটু খট্‌কা। নিজেও এলো একটু হঠাৎ আচমকা! ছোট্ট একটা বাড়ী নিলো ভাড়া, দেশ থেকে ম্যানেজার পাঠাতো যথেষ্ট পকেট খরচ, নাম বাড়লো দ্বিগুণ, লেখা বাড়লো দশগুণ, সঙ্গে সঙ্গে পপুলার হ'লো অসম্ভব রকম।

মেয়েতে মেয়েতে ধূল পরিমাণ। এর মধ্যেই অসংখ্য অটোগ্রাফে লেখা দিয়েছে। অনেকে হয় লেখক, অনেকেই নাম করে কিন্তু সবার ভালবাসার পাত্র ব্যক্তিগতভাবে, খুব কম লেখকই হ'তে পারে। এ দলের লেখকের সংখ্যা খুবই কম। এই লেখকেরা চটকরে হয়ে যায় বন্ধুবান্ধবের প্রিয়পাত্র, কাজেকাজেই তাদের বোন প্রভৃতির ঔৎসুক্যতার বস্তু' সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছিনিমিনি খেলার দ্রব্য! তারাও কৃতার্থ হয় সুপুরুষের সঙ্গে অবাধে মিশতে, কোন কাগজে কোন গল্প বেরুবার আগেই জেনে ফেলে তারা, তাই যখন সেগুলো প্রকাশিত হ'লে লোকে তাদের সামনে বলে' চমৎকার! তারা শুধু ঠোঁট চেপে হাঁসে অর্থাৎ স্বয়ং লেখকের খাতায় দেখেছি। সত্যি এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়! শরৎ বাবু, কেদার বাবু বা রবি বাবুর লেখা লিখতে দেখা বা খাতায় দেখা কতো

আনন্দের! এ বিষয়ে মেয়েরা সবচেয়ে বেশী হ্যাংলা! কোন সুপুরুষ নবীন উদীয়মান লেখকের সঙ্গে পরিচিত থাকলে তারা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকের সামনে সেটা দিতে চায় জানিয়ে, কোন ছলে তার কথা তুলে জানিয়ে দেয় পরিচয়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে অনেকটা গর্ব্ব! পরস্পর দেখায় পরস্পরকে অটোগ্রাফ্, কার কতো প্রসিদ্ধ লোকের হাতে লেখা, রবিবাবু থেকে সুরু করে ডগলাস্ পর্য্যন্ত! প্রাণেশের একটা কবিতা হয়তো বেরুলো কোন কাগজে, লেগে গেলো তা নিয়ে সমালোচনা কর্ত্তে—অর্থাৎ আদি থেকে শেষ পর্য্যন্ত, কলম ধরার ভঙ্গী থেকে, শেষের পূর্ণচ্ছেদ দেবার কায়দাটুকু পর্য্যন্ত যে যা বৃত্তান্ত জানে সব বলতে। কেউ বললো সে জানতো আগে থেকেই কোন কাগজে বেরুবে সেটা, অন্য তাকে একটু নীচু করে' জানায় লেখার, তারিখ, স্থান, সময়। আর একজন গম্ভীর হ'য়ে হয়তো বলে প্রাণেশ নিজে তাকে সেটা পড়িয়ে শুনিয়েছে সব চেয়ে আগে ইত্যাদি! তাকে নিয়ে পড়ে যায় এইরকম টানাটানি, তার প্রাণ হয় অস্থির অর্থাৎ আনন্দে চঞ্চল।

ছোট বেলার ছবিতে রং ধরে, স্বপ্ন বাস্তব হয়, জীবনটাকে ঠিক যেমনভাবে চেয়েছিল গড়তে, হয়েছে ঠিক সেই রকম বরং বোধহয় তার চেয়ে কিছু বেশী! তার কোন আবশ্যক হয় না' শুষ্ক পাতায় পরিপূর্ণ প্রাণহীন ছবি, এখন থাকে একপাল সজীব মুখের মধ্যে। ছোট বেলার কথা মনে পড়ে আর হাসে। লজেন্স খাওয়া কমেতনিই, বেড়েছে বরং। বাড়ীটা ছোট, ভরা থাকে সর্ব্বদা বন্ধুবান্ধবীতে, চায়ের টেবিলে ব'সে বলে নিজে ছোট বেলাকার গল্প যেখানে সম্ভব সেখানে একটু রং ফলিয়ে, হাসির হর্‌রা ছোটে। মেয়েদের হাসিতে যেন ঘরের ছাদ ছিঁড়ে যায়। মেয়েদের হাসি ভাল লাগে তার, তবে মুখটিপে নয়, খুব জোরে যাতে আলজীব্ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

মেয়েদের নিয়ে হয় পৃথক জলসা। সকলেই চায় শুধু একা একা দেখা করতে, বেছে নেয় একটা নিরিবিলি সময় যখন তারা ভাবে যে হয়তো এখন প্রাণেশ একা আছে যেমন দুপুর বারটা ; ফলে এই দাঁড়ায় যে প্রত্যেকে সেইটাই বেছে নিয়ে হাজির হয় ঠিক একই সময়। অদ্ভুত সময়ে তাদের উপস্থিতি দেখে প্রাণেশ বলে—"কী সব একজোটে যে ? ভর দুপুর কী করা হবে শুনী—?" সকলেই একটু চটে অন্যের ওপর মনে মনে, বাইরে হয়তো বলে—"উঃ কী গরম ! আজ শুধু হল্লা করেই কাটাব"— হল্লা সুরু হয় অর্থাৎ প্রাণেশ বলতে সুরু করে তার বাল্যজীবনের অদ্ভুত তথ্য। সেদিন বল্লে সে তার অদ্ভুতভাবে ভাগাভাগি করে' লজেন্স খাবার কথা ! সবাই একজোটে হেসে উঠে তার গল্প শুনে, মনে মনে কী যেন ভেবে নেয় তার এই ভালবাসার অদ্ভুত তথ্য শুনে, নিদর্শন জেনে। সবই অদ্ভুত, খাপছাড়া তার প্রত্যেক কাজ, বিশিষ্ট তার সব— "তাইতো এতো নাম !" "একটুক্‌রো যেন আগুন।"

মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসতো সে রেবাকে। শুধু সেই পেতো তার সাক্ষাৎ একেবারে নির্জ্জন বাড়ীতে, মানে একটু কায়দা করে'। সেটা অবশ্য প্রাণেশেরই চেষ্টায়। বাইরে বসিয়ে দিতো একজন চাকর, দরজা দিতো বাইরে থেকে বন্ধকরে'। কেউ আসলে সেখানে চাকর বলে দিতো—"হুজুর বাহার হোগিঁয়ে"—, এই অদ্ভুত প্রকারে। রেবাকে ভালবাসার একটু কারণ ছিল বিশেষ ! খুব চঞ্চলা, হাসতে পারে খুব মন খুলে', একটু বেশ খাপছাড়া, কবিতাও লেখে দু চারটা (অবশ্য এটা আজকাল সাড়ীর ডিজাইন বাছা গোছের হয়ে গেছে মেয়েদের), ধাঁধা বলতে পারে খুব চমৎকার, অর্থাৎ প্রণেশকে দিত হারিয়ে, অবশেষে কিন্তু অবশিষ্ট নয়, সে খুব চমৎকার লজেন্স কেটে নিতে পারত দাঁত দিয়ে অন্ততঃ পক্ষে বেশীর ভাগটাই সে কেড়ে নিয় প্রাণেশের মুখ থেকে। এটাই তার সবচেয়ে বড় গুণ ! চঞ্চল প্রাণেশকে সে অতিষ্ঠ করে দেয়

যতোক্ষণ থাকে তার বাড়ীতে, তার মানে আজকাল কয়েক ঘণ্টা ছাড়া সকাল থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত প্রাণেশ উপরোক্ত উপায়ে "বাহার হোগিয়ে" হয়ে থাকে। অনুপস্থিতিতে আরো করে অতিষ্ঠ, দিনের মধ্যে বোধ হয় তেত্রিশবার ফোন করে, ফোণে কথা কইতে নাকি তার সবচেয়ে ভাল লাগে তাইতো কোন কোন দিন একদম না এসে দেড়শবার ফোন করে। প্রাণেশের ঘরে ক্রিং ক্রিরিং বেজেই চলেছে! সেদিন কেউ বাইরের লোকে উপস্থিত থাক্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়—এতো কল! তাইতো এতো নাম! প্রাণেশ রিসিভার তোলার আগেই বোঝে কে—ওপার থেকে যা প্রশ্ন আসে তার উত্তর দেওয়া চলে না সকলের সামনে—তাই সে বলে বসে—"কে? ও প্রবাসী অফিস্ থেকে? আচ্ছা কাল আসবেন দিয়ে দেবো!" "আপনি? গুরুদাস থেকে? আচ্ছা আসবেন Copy rightএর কথাবার্ত্তা হবে" এইরকম অসংখ্য। মনে মনে অসম্ভব হাসে। কিছুক্ষণ পর দমকলের মতো এসে রেবা বলে "কী সব বাজে বকছিলে? সব তাতেই ইয়ে না?—উত্তরে প্রাণেশ একটা লজেন্স বের করে রেস দেয়।

অমনি ভাবে কেটে গেল বছর পাঁচেক! প্রসিদ্ধ লেখক প্রাণেশ মিত্র।

একদিনের ঘটনা ভারী মজার! প্রাণেশ গিয়েছিল একপাল মেয়ে নিয়ে কী একটা নতুন ছবি দেখতে, এ রকম যেতো প্রায়ই। ঠিক যেন পিঁপড়ের ভিড় সেদিন ছবি ঘরে (Cinema), সুতরাং মিষ্টি কিছু নিশ্চয়ই, ভালও বোধ হয়। প্রাণেশের এক ছোকরা ভক্ত গেছে আট খানা কিনতে কায়দা করে সেই অসম্ভব ভিড় ঠেলে! ঠিক যেন বিলাতে Test match! প্রাণেশ দাঁড়িয়ে জটলা করছিল মেয়েদের সঙ্গে ঠিক মেয়েদের বিশ্রাম স্থানের সামনে—চূড়ান্ত হাসির হর্‌রা। রোজই এরা এসে এ রকম করতো। প্রাণেশ তাদের রাগায়, হাসায় কথায় কথায়, শুধু লজেন্স খায় না অদ্ভুত

ভাবে পুলিশের ভয়ে কিন্তু চুষতে থাকে সর্ব্বদা। যতক্ষণ না আরম্ভ হয় ততক্ষণ এই ব্যাপার! সকলকেই একটু খোঁচায় বাকী সকলে আনন্দ উপভোগ করে—নানা গল্প, অদ্ভুত অদ্ভুত; বড়লাট থেকে স্থরু করে বাড়ীর ঝিতে এসে অন্য পথ ধরে। রেবা নেয় সবচেয়ে দায়ীত্ব এ জটলার! অন্যান্য মেয়েরা বা মহিলারা অবাক হ'য়ে দেখে, বেশী বয়সের যারা থাকেন তাঁরা একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করেন। পাশের লোকগুলো খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে হ্যাংলার মতো মেয়েগুলোকে দেখে, যুবক ছেলেরা নানা ছুতো করে সেখান দিয়ে বেরিয়ে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। ছেলে বা মেয়ে মহলে যদি কেউ চিনে ফেলে, অন্যকে চেনায়—'জানো ঐ ভদ্রলোক কে? স্বয়ং প্রাণেশ মিত্তির!" ঔৎসুক্য বেড়ে যায়, মেয়েরা বেশীকরে দেখে, ছেলেরা আলাপ করার স্থযোগ খোঁজে!

সেদিনও এই রকমই ব্যাপার ঠিক্! উজ্জ্বল আলো একবারে দিন করেছে রাতটাকে। প্রাণেশ বারান্দার খুব কাছে দাঁড়িয়ে পূর্ণমাত্রায় জটলা কর্চ্ছে আর লজেন্স খাচ্ছে। হঠাৎ একটা ছয় সাত বছরের ছেলে সেই বারান্দার সামনে থেকে, এগিয়ে নেমেই, প্রাণেশের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে উঠ্‌লো—"বাবা—ও বাবা!" মেয়েরা হো হো করে হেসে উঠ্‌লো, প্রাণেশ চটকরে ছেলেটার মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তার হাতে গোটাকতক লজেন্স পুরে দিয়ে দূরে মিশে গেলো ভিড়ের মধ্যে! বারান্দার মেয়ে মহল মুখ টেপাটিপি করে হাসতে লাগলো—কী বলাবলি করলো প্রাণেশ আর শুনতে পাইনি! তবে এ মেয়েরা পেয়ে গেল এক অপূর্ব্ব স্থযোগ তাকে রাগাবার! অনেকে অনেক কথা বলে ফেল্লে! "কিন্তু ছেলেটা দেখতে হুবহু তোমার মতো!" "আহা তার মাকে একঝলক দেখে নিলে না কেন!"

এই রকম অনেক যুক্তি! রেবা শুধু বল্লো—"কই এতোদিন তো

বলোনি এ কথা, কোন বেচারীর সর্ব্বনাশ করেছো ?

উত্তরে স্তব্ধ অজ্ঞাত প্রাণেশ গোটাকতক লজেন্স মুখে পুরে' দেয় !

রাত এগারটা বেজে দশ মিনিট ! প্রাণেশ তার লেখার ঘরে বসে ঘস্ ঘস্ লিখে যাচ্ছে একা—আজ সত্যিই একা ! দশটা সাড়ে দশটার পর রেবাছাড়া আর কেউ থাকে না বড়, সেই রেবাই, আজ আসেনি ! ক্রিরিং, ক্রিরিং, ক্রিরিং। প্রাণেশ মুখ না তুলেই হাঁসে। এই সুরু হ'লো ! পাশ থেকে তুলে নেয় রিসিভারটা, ওপারে কে ধরেছে বুঝতে আর বাকী থাকে না—আজ সেই গুচ্ছের কথা বলে যাবে তার প্রশ্ন শোনার আগে !

"হ্যাঁ বুঝেছি—এতো রাতে বিরক্ত করার জন্য কাল শাস্তি দেবো, নিতে হবে কিন্তু। ফোণে চুমু খেতে জানো ? নিশ্চয়ই জানো না, কাল এসো শিখিয়ে দেবো।" আরো কী সব যেন বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ ওপার থেকে শুনতে পেলো—"আজ্ঞে না ভুল করেছেন বোধ হয়, আমি অন্য লোক, একটু বিশেষ দরকারে এতো রাতে বিরক্ত কর্চ্ছি, দেখুন আমার ছেলেটার আজ কদিন খুব বিকার জ্বর, একবার যদি আসেন দয়া করে—"

"আপনি কাকে চান ? আমি প্রাণেশ মিত্তির—ডাক্তার ত' নইই বরং লেখক বটে—" প্রাণেশ বলে' হাসে। না জানি প্রথমে কথাগুলো বলেচে হয়তো বা ভীষণ মোটা কালো দাড়ি-গোঁফপূর্ণ একখানা মুখকে ! দ্যূত্। ভারী রঙ্গ লাগল তার, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে খাণিকক্ষণ হেসে নেয়।" দেখি মজাটা। ফের শোনে।

"আজ্ঞে আপনি ডাক্তারও তা জানি, দয়া না করলে—

"কী অবস্থা ?—মরতে কতো দেরী ?" এখন প্রশ্ন কেউ কখনো করেছে !

"আর বোধ হয় দেরী নেই—ভয়ানক শ্বাসকষ্ট—"

প্রাণেশ হঠাৎ বলে ওঠে—'তা হ'লে যাবো—ঠিকানা ? ওঃ আচ্ছা আস্ছি—"

মৃত্যু! মৃত্যু!! বহুদিন পরে আবার মৃত্যুকে সামনে দেখবে—সামনা-সামনি। লেখকের অস্তিত্ব ভুলে যায় সে। প্রাণেশ মিত্তির ডাক্তার!!! ছোট বেলার নেশা চাপে ঘাড়ে—কী চমৎকার মৃত্যু জিনিষটা, বহুদিন তার সাক্ষাৎ পায়নি! এই যে এতো লোকের সঙ্গে আলাপ একটাও কী ছাই মরে।

লেখাটা উলটে দিল টেবিলের ওপর, খুঁজে বের করলো তার ব্যাগ, বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়! রাত্রের ফেরার অনিশ্চয়তা জানিয়ে যায় চাকরকে!

একখানা ছোট্ট দোতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়াল তার ট্যাক্সি! এই বাড়ীইত? কই অসুখের তো কোন লক্ষণ দেখছি না! মারা গেল নাকি? বাঃ! এতোটা পরিশ্রম, আশা বুঝি মাঠে মারা গেলো! আবার না জানি কতো দিন পর মৃত্যু দেখবে! খুব খানিকটা হর্ণ বাজালো! একটা আলো নীচে নেমে এলো! মটরের কাছে এসে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওপরে! ট্যাক্সিখানা তৃপ্ত হ'য়ে চলে গেল!

স্তব্ধতার বিভীষিকা! চুপ্‌চাপ উঠ্‌লো ওপরে! ঢুকলো একটা ঘরে! সবুজ একটা বাল্ব জ্বলছিল—ঘরটা যেন পাতালপুরীর রাজকন্যার ঘর! প্রাণেশ ঘরে ঢুকতেই 'টাপ্' 'টুপ্' দুটো শব্দ হ'য়ে সবুজা নিবে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠ্‌লো। মুহূর্ত্তে দেখা হ'য়ে গেলো ঘরের মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা! দুধারে দুখানা খাট! একখানায় একটা কী যেন ঢাকা, নিশ্চয়ই রুগীটা—মাথার কাছে বসে একজন স্ত্রীলোক বাতাস করছে তার মাথায়! তবে মরেনি! মেয়েটা চট্‌করে একটু মাথার কাপড় টেনে নিয়ে আবার খুলে ফেল্লো তার ঘোমটা!

প্রাণেশ জীবনে কখনো ভূত দেখেনি, দেখলে হয়তো এতোখানি চমকে উঠ্‌তো না! উঠে এসে যে প্রণাম করলো সে আর কেউ নয়—"নমামি!"

মিনিট খানেক স্তব্ধতা !

"নমি—তুমি ! কী ব্যাপার ! আমার ঠিকানা জানলে কী করে ? এতো রাতে কী দরকার" কী গুচ্ছের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে গেলো ঝোঁকের মাথায় !

হঠাৎ ছেলেটা (পরে জানা গেল) চিৎকার করে উঠ্‌লো ! "কই আমার বাবা কই,—বাবা ! ঐ যে—ঐ যে আমার বাবা—বা—বা—আঃ—" ছেলেটা ঠেলে উঠ্‌তে চায়, গায়ের চাদরটা দিলো ফেলে, চোখ দুটো যেন কপালে উঠেছে, মুখ খানা কালো, মৃত্যুর ছায়া বেশ ঘনিয়ে এসেছে তার সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ! প্রাণেশের মনে কী যেন একটা ধাক্কা লাগল, মাথাটার মধ্যে টিপ্ টীপ্ করতে করতে কী যেন খুঁজতে লাগল ! কোথায় যেন ছেলেটাকে দেখেছে !!! আরে দ্যাত্ ! বেকার ভাবনা !

মেয়েটা তাড়াতাড়ি কী যেন একটা নাকের কাছে ধরলো মাথায় খানিকটা জল দিল।

"প্রাণেশদা বসো, অনেক কথা !!" তার দুচোখ ভরে' উঠ্‌লো জলে।

"কী কথা নমি, আবার ডেকে অপমান করবে নাকি ? একবারেও মন ভরেনি !"

"প্রাণেশদা এখন আর ব্যথা দিওনা আমার সর্ব্বনাশের সময়, উঃ !"

প্রাণেশের বেশ আনন্দ হ'লো মেয়েদের মনে আঘাত দিতে তার সবচেয়ে ভাল লাগে সেই কোন ছোটবেলা থেকে।

নমামি ইতিবৃত্তান্ত যা বল্লে তা খুব ছোট্ট। সেইদিন সিনেমাতে প্রাণেশকে বাবা ! বাবা ! বলে' জড়িয়ে ধরবার পর ছেলের কী একটা হ'লো, পরদিন এলো ঠেসে জ্বর, সঙ্গে সঙ্গে বিকার আর মুখে শুধু ঐ এক বুলি বাবা ! বাবা ! আজ হ'য়ে গেল তিন দিন !

ডাক্তার আশা দিয়েছে ছেড়ে, বলেছে "যাকে চায় তাকে আনতে না পারলে সারবে না" কী যেন একটা ইংরিজি নাম করেছে অসুখটার! প্রবাসী অফিস থেকে নম্বর নিয়ে আজ বাধ্য হয়ে তাকে ফোন করেছে পরিচয় দেয়নি পাছে সে না আসে!

প্রাণেশের কাছে, সেদিন সেই সিনেমার বৃত্তান্ত থেকে আজ পর্য্যন্ত সব জল হয়ে গেল! সে ছিল নমির ছেলে! তাই যেন কে বলেছিল "হুবহু তোমার মতো দেখতে" প্রাণেশের ঠোঁট চেপে একটু হাসি বেরিয়ে গেলো! মনে পড়ে গেলো অনেকগুলো ছবি! ঠাট্টা তার স্থানপাত্রাভেদে!

"তোমার ছেলে তো অদ্ভুত! অমন যাকে তাকে বাবা বলতে শিখিয়েছ কেন? নিজের বাবাকে চেনে না! তোমার স্বামী কোথায়, তিনি সামনে আসলেও কী এ চিনতে পারে না?

"না তাকে দেখে বলে ওঠে" তুমি আমার বাবা নও আমার বাবা ওই বায়স্কোপের বাসায় " সে বিকার বলে উড়িয়ে দেয় কিন্তু প্রানেশদা আমিতো সব বুঝি ওকে তুমি বাঁচাও প্রণেশদা ও তো তোমারও ছেলে!!"

সে কী!! ভাগ্যিস্ বাংলা সমাজ ছিল না ঘরের মধ্যে, ভাগ্যিস্ আকাশ ছিল না মাথার ওপর তা হলে নিশ্চয়ই পড়তো ভেঙ্গে তাদের মাথায়!

প্রাণেশ ঝুকে দেখে ছেলেটার মলিন মুখ! স্থির নিমীলিত চক্ষু! নমি ডাকে "পিণ্টুলী দেখতো কে এসেছে! দেখোতো লক্ষ্মী বাবা আমার দেখোতো!"

পিণ্টুলী চোখ মেলে! জড়িয়ে ধরে প্রাণেশকে "বাবা বাবা! মামণি এইতো আমার বাবা, বাবা তুমি যেয়ো না, বলো যাবে না!"

জবাব দেয় নমামি "না বাবা যাবে না এইতো তোমার কাছেই আছে

স্থির চক্ষু দিয়ে পিণ্টুলী প্রাণেশকে দেখে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি, আবেশ বিহ্বল! ঘোলাটে হয়ে গেছে চাউনি! ঠোঁটে কোণে ফুটে ওঠে একটু ভাঙ্গা হসি!

"খোকা লজেন্স খাবে ?"

হ্যাঁ বাবা খাবো তোমার সেই লজেন্স আরও দাও!" প্রাণেশ দুটো লজেন্স বেরকরে পকেট থেকে তার মুখে দিয়ে দেয়! নমামি একটু হাঁসে!

"এখনো লজেন্স খাও? দ্যাখো পিণ্টুলীর চাউনি যেন একটু ভাল হয়েছে তোমাকে দেখে, না? কী সুন্দর লজেন্স খাচ্ছে! আচ্ছা এখন কার সঙ্গে ভাগাভাগি করে লজেন্স খাও প্রাণেশদা? বিয়ে করেছ?"

"না, নমামি ছাড়া কী আর দুনিয়ায় মেয়ে নাই!" পুনরায় ব্যথা, পুনরায় আনন্দ!

যতোবার চায় প্রাণেশ পিণ্টুলীর মুখের দিকে ততোবার তার ভেতরে একটা কী রকম যেন হ'য়ে যায়। মাথার ভেতরে টিপ্ টিপ্ করে যেন ব্যাটারী চল্‌ছে, শিরায় যেন রক্তগুলো পূর্ণবেগে দৌড়চ্ছে প্রাণের দিকে অনুভূতি জানাবার জন্য, পথে লাগছে ধাক্কা বিপরীতমুখী দলের সঙ্গে। প্রাণেশের মধ্যে জেগে ওঠে তার ছোটবেলার ভূত! পিণ্টুলী! নমামি!! তার ছেলে!!! আর একটু হ'লে প্রাণেশ হাঃ হাঃ করে' হেসে উঠতো। নমামির দিকে তাকায়—এই নমি একদিন তাকে— — —হাঃ হাঃ হাঃ মনে মনে খুব জোরে হাসে, চোখ্ ভাষা দেয়! প্রতিশোধের বিশ্রীভূত তাকে কোন দিনই ছাড়েনি শৈশব থেকে, জীবনে জানতো না ক্ষমা, বাইরণ দিয়েছিল তাকে এই বিভীষিকা দীক্ষা! প্রাণটা তার আনন্দে লাফিয়ে ওঠে,—তুলে নেয় ব্যাগটা,—খোলে—উঠিয়ে নেয় একটা শিশি! নমামির চোখের দিকে আগুন জ্বালান চোখে তাকায় একবার! এটা যদি তাকে পারতো খাওয়াতে! না—আঃ! তা হ'লে ত সে কিছুই

জানতে পারতো না! এই ঠিক্! এই ঠিক্! প্রাণেশ সেই বিষ একটা গ্লাসে ঢেলে খাইয়ে দেয় পিণ্টুলীকে! নমি বলে—

"খাও তো বাবা! তোমার বাবার ওষুধ! কালই সেরে যাবে—!" পিণ্টুলী লক্ষ্মী ছেলের মতো খায়। মিনিট কয়েক পরে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে! প্রাণেশ বলে নমামিকে

"ওষুধ দিলাম, আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়বে, বুঝলে? কেমন থাকে কাল ভোরেই ফোন ক'রো! এইতেই ভাল হয়ে যাবে!

"আমি জানতাম, তুমি নিষ্ঠুর হবে না প্রাণেশদা, যতোই তুমি রেগে থাকো, তোমার নমিকে ভুলবে না!

নমামি ধরাগলায় বলে!

"আচ্ছা তোমার লজেন্স খাওয়া মনে আছে? পার এখন খেতে? খাওতো এটা!"

সে একটা লজেন্স বের করে, মুখে ধরে' কুট্‌করে কেটে নেয় দুজনে, চুক্ ক'রে প্রাণেশ তাকে একটা চুমু খায়!

ছুটে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়! পিছনে নমামি ঠোঁট চাটে!

প্রাণেশ ভোরে কিন্তু আর কোন খবর পায়নি!



পৃথিবী ও তারই একটি লোক।

(প্রথম দৃশ্য)

ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন। ফ্রয়েড অনুসারে সেটা সেদিন হঠাৎ সাড়া দেওয়াতে দু বন্ধুতে কলকাতার এক ক্ষুদ্রতম মেসে নিলো আশ্রয়। পড়তো রংপুর কলেজে, দুজনাই পরীক্ষার্থী, একজন B. A. র, আর একজন I. A র। পৃথিবীতে সমস্ত জিনিষেরই নাকি কারণ থাকতে বাধ্য, অতএব এরও ছিল। এর কারণ খুঁজতে হ'লে দু এক পা পেছুতে হবে—।

তাদের একজন ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যক সুতরাং প্রেমিক, শুধু এইটুকু বল্লেই তার যথেষ্ট বলা হ'লো—তরুণ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের এর চেয়ে বেশী পরিচয়ের কী দরকার! সে কথা তো বিনিয়ে বিনিয়ে অনেকেই লিখেছেন—বেশী চট্‌কালে······ঐ যে কী বলে তাই হবে! তবে একটু চুট্‌কী সেঁটে দি বড় বিজ্ঞাপনটার ওপর। সে সাহিত্যিক, একটু অন্য রকমের অর্থাৎ ১৯৮০ সালে বাইরণ যা হতেন তাই (অবশ্য তিনি যদি গান্ধী না হ'য়ে পড়েন ভাগ্যক্রমে)।

আর একজন বাঙ্গালীর ছেলে! বাস্‌! সবকিছু ওখানেই বলা হ'য়ে গেল! এবার I. A. দিতো। বাপ বড়লোক। যুবক বাঙ্গালী অন্নের অভাবে বিধাতা ছাড়া বিদ্রোহ আর কারুর ওপর করতে জানে না।

কলেজের হোষ্টেলে হুজন একরুমে থাক্‌তো, শুধু তারাই হুজন! এক জায়গায় বাড়ী! সম্পর্কেও কী যেন একটা হয়! পড়াশুনাটা জীবনের সবচেয়ে বড়ো জিনিষ নয়। সাহিত্যিক বন্ধু ক্রমাগত দশ বছর ধরে দিন রাত ধরে এই কথা শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে—ফলে এই দাঁড়ালো সে করলো হুবার ফেল, আর তার বন্ধু····· ধরেনিন একটা কিছু, ওটা আমার প্রধান বিষয় বস্তু নয়! একজন লিখতো গল্প, অন্য তা শুনে করতো সমালোচনা, ফাঁকে ফাঁকে দিতো চায়ে চুমুক, চাকরকে বলতো ডিম ভেজে আর এক পেয়ালা চা ঢালতে!

সাহিত্যিক বন্ধু বলতো তার অদ্ভুত তথ্য! পড়িয়ে শোনাতে নতুন প্রকাশিত কবিতা প্রাণ ঢালা ভঙ্গীতে! কাগজে কাগজে দিতো লেখা, সঙ্গে দিতো ফেরৎ আসার জন্য যথেষ্ট ডাকটিকিট, রোজ সকালে তাকিয়ে থাক্‌তো "পিয়নের পথের পানে" Test ও এসে গেলো! উঃ—জীবনটা এতেই গেলো—হ্যত্‌! সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে! ভাবগতি দেখে, ছুটীতে মুখে বলে, অন্য সময়ে চিঠিতে বাপ জানায়—বাবা কোন রকমে B. A. টা পাশ করে দও—" ওটা বেকার হ'য়ে দাড়ায়! এ নেশা সবকিছু ছোট দেখে! নতুন কোন লেখা বেরুলে বাবা আরো ভড়্‌কে যায়-যাক্‌!

লিখবে—শুধু লিখবে! বাংলা সমাজকে দেবে চম্‌কিয়ে, চূড়ামণি চূড়ামণিতে হবে সংঘর্ষ, সমাজের সকলের বুকে জ্বালবে হিংসার দাহ, মেয়েদের বুকের রক্ত ফুটিয়ে তুলবে, তাদের অন্তরে জ্বালাবে হিংসার, ঘৃণার, ঈর্ষার, আক্রোশের, হতাশের তীব্র দাহ! সকলে তাকে দেখে নাক সিট্‌কিয়ে ভ্রূ কর্ব্বে কুঞ্চিত, লেখা পড়ে, তথ্য শুনে চম্‌কে উঠ্‌বে, তারা কোরবে আত্মগোপন নিবির কালিমার মধ্যে, মরবে যখন এক কক্ষ্যচ্যুত তারার মতো, সকলে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাক্‌বে, মনে মনে দশটা দেবতার নাম করবে! তারপর ······। ২৫ কী ৫০ বছর পরে সকলে

তাকে করবে পূজা! তখন বুঝবে লোকে বহুদিন পূর্ব্বে অঙ্কিত তার ছবির সঙ্গে তখনকার বাস্তবের ছবির সামঞ্জস্যতা! তার তথ্য ছিল—"ঘরের মধ্যে নগ্ন হতে পারি—আর বাইরে এসে বলতে পারি না যে ঘরের মধ্যে নগ্ন হয়েছিলাম?—" সমাজ বলে—"না—" সে বলে—"আলবৎ"

তাদের দিনগুলো এমন ভাবেই বেশ কাটছিল কলেজে, হোষ্টেলে—গল্প লিখে, সমালোচনা করে', চা খেয়ে, বাছা বাছা মেয়েদের বিষয় আলোচনা করে' রাত একটা, দুটো—যতো ইচ্ছা! Light off হবার পর জলতো রাতে পড়ার জন্য কেনা আলো, জ্বল্‌তো ষ্টোভ্,—চলতো গল্প!

একদিন রাত! প্রায় ২টা বাজে! অবান্তর গল্পের স্রোত চলছে—জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করা হচ্ছে! সত্যি আর পারি না, আমার মনে হচ্ছে এই বইয়ের পোকা বাছ্‌তে বাছ্‌তেই অন্তরের ঘা যাবে শুকিয়ে, সাহিত্য যাবে মরে'। ঐ যে কী বাবার মত B. A. পাশ করে' যতো ইচ্ছে লেখো কেও বাধা দেবে না—লেখার দাম হবে,—সঙ্গে ঐ লেজুরটা না থাক্‌লে দাম বাড়ে না—' হাঃ হাঃ কী অদ্ভুত তথ্য! কই বড় লেখকের কী কোন লেজ আছে? ধূমকেতু আবির্ভূত হয় গগনে—সঙ্গে থাকে প্রকাণ্ড এক পুচ্ছ, বিস্তীর্ণ আকাশের প্রত্যেকটী জ্যোতির্ম্ময় পৃথিবী অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে তার দিকে, ভয়ে হয় পাণ্ডুর,—তাদের ভয় হয় দ্বিগুণ, নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে কেঁদে ওঠে তখনই—যখন ধূমকেতুর খসে পুচ্ছ! পুচ্ছহীন কেতু যে কোন মুহূর্ত্তে ঘটাতে পারে প্রলয়, ঘটাতে পারে অসীম নিলীমায় তারায় তারায় সংঘর্ষ! চুর করতে পারে বিধাতার বিরাট সৃষ্টি!

অসাহিত্যিক বন্ধু তাতে দিলো ইন্ধন! সেও আর পারে না! চার বছর একই বইএর পাতা উল্‌টাতে উল্‌টাতে তার কোণগুলো হাতের ঘামে ঘামে ছিড়ে গেছে!

দুজনে কী যেন একটা ঠিক করলো'। ভোরে ট্রেনেই কল্‌কাতা! বাস্! সন্ধ্যার আগে সল্‌তে পাকানো ঐটুকুই!

ছোট্ট একটা মেসে! একই ঘরে দুজন! কলকাতায় দরিদ্র কেরাণী-দের মেসের অভাব নেই, তার বর্ণনারও অভাব নেই!

প্রদোষ লেখে বই, পত্রিকার দ্বারে দ্বারে ঘুরে যথাসময়ে পায় অতি সামান্য!

সুহাস তিন বেলায় তিনটী টিউসনি করে! মাসে ৪৫৲ টাকা আদায় খরচ দুজনার! প্রদোষের পয়সায় তারা খায় না, জীবনকে চেনে! কখনো সিনেমা, কখনো থিয়েটার, কখনো বা এই একটু এদিক ওদিক!

দিন যায়!

বড় দিনের পূর্ব্বে মাতোয়ারা কলকাতা! মিষ্টি শীত!

"কীরে—এই! আজ আর উঠ্‌বিনানাকী? ঘড়ি দেখ্‌তো কটা বাজে!"………

"উঁ—উঁ—" প্রদোষ পাশ ফিয়ে শোয়! লেপ বেশকরে জড়িয়ে নেয় গায়ে!

"ফের পাশ ফিরে শুস্‌ছিস্—দেখবি মজা! ওরে—শ্রীধন একটু ঠাণ্ডা জল আনতোরে—।"

শীতকালে গায়ে জল! ঘুম ছাড়তে বাধ্য হ'লো প্রদোষকে! উঠে বসলো বিছানায়! ঘরের এক কোণে জল থৈ থৈ! তার মাঝে ভাসছে পটলের বিচি, আলুর টুকরো—আরো যেন কী! সুহাস বসে' সেটা পরিস্কার করছে, ন্যাক্‌রা দিয়ে মুছ্‌চে শুষ্ক জায়গাটাকে!

"জলের মধ্যে তরকারী কী করে এলোরে!—আলুর দম্ করতে গিয়ে ফেলেছ বোধহয়!—কোন কর্ম্মের নয়! একটু দেরী করতে পারলে না? আমি উঠেই না হয় রাঁধতাম্! কই রুটী কই, আটা কই, জল কই, চা কই……" থামতে বাধ্য হয়, কারণ দম গিয়েছিল ফুরিয়ে!

"জলের মধ্যে লাল কী ভাসছেরে—তেল বুঝি ফেলেছিস্! নাঃ! তোকে নিয়ে আর চল্‌লো না!… …"

সুহাস ততক্ষণে সবটা পরিষ্কার করে ফেলেছে! সুহাস একটা কথারও জবাব দেয়নি! শুধু হেসে একবার বলেছিল—"তোমার মাথার দম্—" বোধহয় ঠিক আলুর দমের উত্তরে!

"তোর বিছানা কই—? বেচেছিস্ নিশ্চয়ই! কেন? চা-নেই বুঝি! না-কি অন্য কাউকে আধেক ভাগ দিয়েছিস্! কাকে দিলি ভাই। আহা। আমাদের ঝিকে দিলি না কেন? দিব্যি ঠাসা মাল! টাপ্‌টুপ্ ভরা!"

"ফের যাতা বক্‌ছিস্? এবার কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা দেবো! মুখ ধুতে গেলি! ঐ যে ঝি এসেছে! কই গেলি! মুখ ধুতে তো তোর একঘণ্টা, এদিকে চায়ের ওপর তো সাদা সর পড়ে' যাবে!—উঠ্‌লি?"

"হ্যাঁ—এই যে—"

প্রদোষ বিছানার চাদরটা পরণে জড়িয়ে উঠে পড়ে!

ব্রাসে একটু পেষ্ট টিপে নেয়! দরজা দিয়ে বের হবার সময় ঝির বুকটিপে বলে যায় রামকমলের কীর্ত্তনের সুরে—"এতো কঠিন কবে হ'লে—এ—এ—" শেষ টানটুকু কলতলা পর্য্যন্ত থাকে, মুখে এক কুলকুচি জল নিয়ে তলিয়ে দেয়! এটা শিখেছে ন্যাভরোর "Call of the flesh" দেখে!

পিছনে সুহাস্ বলে—"ইডিয়ট—"

আলু পটলের দম কোত্থেকে এলো, বিছনা কোথায় পাঠিয়েছে, জানতে হ'লে এক পা পিছুতে হবে। ঝি আর সুহাস থাক্ ঘরে!

কাল রাতে তারা যখন মেসে ফেরে তখন রাত দুটো! প্রদোষ মদে চুর হ'য়ে, সুহাসের কাঁধে নিজের সমস্ত ভার ন্যস্ত করে' উঠ্‌ছে সিড়ি দিয়ে ওপরে! দুনিয়ার যতো অবান্তর কথা বকে' যাচ্ছে! নিজের লেখা কবিতা আউড়ে যাচ্ছে! সিড়িতে পা রাখতে গিয়ে রাখছে সুহাসের

পায়ে, কন্‌কনে শীতে পা চিপে যাওয়াতে তাকে ধম্‌কাচ্ছে—"এই—! পা দেখে ফেলতে পার্‌ছিস না ?" প্রদোষ আবৃত্তি করে তার কবিতা থেকে—

"চঞ্চলের প্রতি পদক্ষেপে

অন্ধকার ওঠে কেঁপে কেঁপে—" কী বলিসরে

অঁ্যা! আমি সৃষ্টি করছি—Production.

বারান্দা দিয়ে চল্‌ছে! তার টলাতে সুহাসও ওরকম একটা ভার নিয়ে নিজের ভার সাম্‌লাতে পারছিল না! তার কাঁধ যেন খসে যাচ্ছে—টন্ টন্ করছে ব্যথায়!—'এই চেয়ে চল্‌তে পারছিস না ?'

সুরু হয় রবীন্দ্রনাথ—

—কারো পানে ফিরে চাহিবার

নাই যে সময়—নাই—নাই—না—আ— — —ই—

ঘরের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে—"রোজ রোজ ভাল উৎপাত্—!*

কেউ কানে নেয় না!

ঘরে আসে!

"এই প্রদোষ! আমার বিছানার ওপর বস্‌তো একটু, তোর বিছানাটা খুঁজে দেখি কোথায়!"

সুহাস খাটের নীচে থেকে বালিস, তোষক বের করে'—চেয়ারের ওপর থেকে চাদরটা নিয়ে ওর খাটে বিছানা করে!

'ম্লাখ্ মাইরি, দাঁড়িয়ে মুত্‌তে সবচেয়ে আরাম—তাইতে সাহেবেরা—দেখিস্ হেঁ হেঁ বাবা!—সব আরামটুকু ওরাই জানে ভোগ করতে—

প্রদোষ দাঁড়িয়ে সে আরাম উপভোগ করে' সুহাসের বিছানা ভাসিয়ে দেয়!

"এই রাস্কেল—কী করলি ? কোথায় এই শীতের রাতে শোব বল্‌তো!"

"চোপ্ রও শালা! রাস্কেল বলোনা! খু-ন করে দেবো! কোথায় শোবে ? মাভাগাস্কারে!" মুখ ভেঙ্গচিয়ে নিজেই হেসে ওঠে!

"ফের বক্‌বিতো এই রেলিং টপ্‌কিয়ে দেবো ফেলে-ভাল উৎপাত্‌—"

"চি-ৎ-পাত্‌!" প্রদোষ নিজের বিছানায় ধপ্‌ করে বসে পড়ে! ওঃখ্‌ মাইরি-ই—প্রদোষ সুহাসের গা ভাসিয়ে দেয় বমি করে' দুপুরের মেসের আলুর সবগুলো টুক্‌রো তুলে' ফেলে! সকালেই খাবার সময় সে ম্যানেজারকে গালাগালি দিয়ে বলেছিল—"শালা—এই খাওয়া, বাড়ী গিয়ে ফেরৎ না দিয়েছি যদি তোর গায়ে বমি করে' তবে আমার নাম প্রদোষ রায়ই নয়!"

সুহাস জল এনে তার মুখ ধুইয়ে শুইয়ে দেয় তার বিছানায়!

সেই শীতে স্নান করে' সমস্ত রাত বসে' প্রদোষের গল্পের খাতা নিয়ে পড়েছে-আর প্রত্যেকটা গল্প শেষ করে' এক একবার প্রশংসাপূর্ণ চোখে ঘুমন্ত প্রদোষের দিকে তাকিয়েছে—

—তারপর—

(প্রথম দৃশ্য শেষ)

—০::(*)::০—

পৃথিবী ও তারই একটি লোক।

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন! প্রয়োজন হলেও আমি দিতে বাধ্য নই! ভূমিকা বাস্তব নয়, ওর মূল্য যৎ কিঞ্চিৎ কারণ ওটা প্রত্যক্ষ দৃশ্যের আভ্যন্তরিক সমস্যার সমাধান! যবনিকা অপসৃত হবার পূর্ব্বে প্রেক্ষাঘরে আয়োজন, অভিনেতা অভিনেত্রীদের সজ্জা, তাদের গোপন সমস্যা দেখার মতই ভূমিকা কদর্য্য, কুৎসিৎ! শত সহস্র দর্শক যা দেখবে, তাদের যা দেখার অধিকার সেটাই আপনারও অধিকার, আমারও! যেটা বাস্তব, সেটাই আপাততঃ সত্য। বাস্তবকে, প্রত্যক্ষকে চিরে চিরে, তার বস্ত্র উন্মোচন করে তার শিরার প্রশিরার প্রতি রক্তবিন্দুর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে, তাকে নিংড়ে তার কুৎসিৎ ভাব নেবার বা তার অভ্যন্তর থেকে তথাকথিত আদর্শ বেছে নেবার অধিকার আমার নেই!

ধীর যবনিকা উঠলো! শত সহস্র দর্শক যা দেখলো আমিও তাই, আপনিও, তাদের পরিবর্ত্তন ঘটেছে যথেষ্ট, আভ্যন্তরিক অনাভ্যন্তরিক দুইই!

কপালের বা পুরুষাকারের জোরে নিদারুণ অর্থ সঙ্কট হয়েছে দূর—এসেছে অর্থ সাচ্ছল্য, সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রচুর আলো, আনন্দ, স্ফূর্ত্তি, জীবন! ইএ অর্থই পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, এই অর্থই জাগিয়ে তুলেছে তাদের মনে

একটা তীব্র অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা, গড্ডালিকা প্রবাহের অনাবিল স্রোতে হাত পেতে থাকতে একখণ্ড তৃণ ধরবার জন্য, এই অর্থই জাগিয়ে তুলেছে তাদের মনে চিরপরিচিত রঙ্গীন আলো, যে আলো প্রতিফলিত হয়েছে এবং লোভনীয় করেছে সেই সব পদার্থ, যে গুলো ছিল তাদের কাছে হেয় কারণ পুরোণ, পরিচিত এবং যে গুলোকে তারা ঘৃণা করতো বলেই আমি তাদেরকে ভালবাসতাম !

এই পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী সম্পূর্ণ ভাবে সুহাস। অজ্ঞাত ভাবে প্রদোষ সুহাসকে অনুসরণ করছিল, তার ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে তাকে স্মরণ করিয়া দিতো তাদের বহুপূর্ব্বে গঠিত জীবনের কার্য্য তালিকা ! সুহাস অদ্ভুত যুক্তি শোনাত, সে যুক্তি প্রদোষ মেনে নিতে পারতো না তবুও একটু শ্লেষের ও বেকার হাসি হেসে সে চুপ করে যেতো !

টালিগঞ্জে এক ছোট্ট বাসা ভাড়া নিয়েছে ! প্রদোষ এখনো কোন সঠিক কিছু মোটা মাইনেতে একটা চাকরী জোটাতে পারে নি অর্থাৎ চেষ্টাও করেনি। চাকরী নাকি তাকে দিয়ে জীবনে হবে না ওটা বড় একঘেয়ে। কী খেয়াল চাপল সেবার বি,এ, টা দিয়ে পাশ করে নিলো। ওটার কোন উদ্দেশ্য ছিল না শুধু তার জীবনের কতকগুলো খেয়ালের একটা মাত্র। দুটো মাষ্টারী এখনো করে, তাও দুমাস অন্তর হাত বদলাচ্ছে কারণ বেশীদিন একই জায়গায় মাষ্টারী করা তার ধাতে সয় না, একঘেয়ে হয়ে দাড়ায়—তাছাড়া—কী একটা কারণ যেন তার ছিল ! এইতো সেদিন তার ব্যারিষ্টারের বাড়ীর চাকরীটা যখন ছেড়ে দিল তখন সুহাস একটু আশ্চর্য্যন্বিত হলো—মর্ম্মাহতও ! অত মোটা মাইনে ! তার প্রশ্নের উত্তরে প্রদোষ যা বলেছিল তা অদ্ভুত।

রেবা (যাকে সে পড়াত) নাকি পুরোণ হয়ে গেছে ! তার আভিজাত্য সুমার্জ্জিত, চিত্রিত ভ্রূ থেকে পায়ের অদ্ভুত নখর পর্য্যন্ত প্রতি রোমকূপ

হয়ে গেছে তার পরিচিত, নিবিড় ভাবে; পুরোণ ভাবে অনাকৃষ্ট! নতুন চাই! সুহাস একটু দুঃখিত হয়ে বলেছিল "এই দিনে তুই অমন চাকরীটা—নতুন তোর জন্য কী রোজ রোজ গজাবে? প্রদোষ উত্তর দেয়নি! পরদিনই একটা চাকরী পেয়েছিল! বাংলা সাহিত্যে সে একটা প্রসারিত নাম কিনেছিল (সনাতনীরা এটাকে দুর্ণাম বলেন) বিখ্যাত প্রদোষ রায়! লিখে সে এখন বেশ মোটা উপার্জ্জন করছে! নানা রসের গল্প লিখে অর্থ উপার্জ্জন তার সবচেয়ে প্রিয়, বাঞ্ছনীয়! বাস্তবের যে অঙ্গ 'গুলোকে সনাতনী লেখকেরা তাদের আদর্শ ভাবের মিথ্যা আচরণ দিয়ে এতোদিন ঢেকে রেখেছিলেন সে গুলোকে নগ্ন করে তার কুৎসিত কদর্য্য (?) তাকে লোকের চোখের সন্মুখে তুলে ধরাকে সে তার লেখক জীবনের কর্ত্তব্য মনে করতো, আনন্দ পেতো! চতুঃপার্শ্বে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সে গুলোকে "চুপ্ চুপ্" করে ঢাকবার চেষ্টা করলেই তার সার্থকতা হবে না, পৃথিবী ভূলে যাবে না! সে ক্ষেত্রে পৃথিবী হবে উৎসুক, বিপদ হবে অবর্ণণীয়! সে গুলোকে সকলের সামনে তুলে ধরো, কাজ হবে! এই ছিল তার যুক্তি! বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা শুধু লিখে জীবিকা উপার্জ্জন করবেন এমন দুঃসাহস কেউ করেন না, এমন সুদিন ও আসেনি. খুব শিগগিরই যে আসবে এমন ভরসা করে না কেউ! এটা বোধ হয় পরাধীনতার একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ! আর পশ্চাত্য প্রদেশে অবর্ণীয় ইতিহাস! এডগারের নাকি এক একটা শব্দের দাম কত পাউণ্ড হয়েছিল!

সুহাসের যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে সেটা অচিন্তনীয়! আমিই বিশ্বাস করতে পারিনি, আপনি তো দূরের কথা! সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য্যজনক, যেটা তাদের জীবন তালিকায় পুনশ্চ দিয়েও লেখা ছিল না, তাদের জীবনের ছিন্নপত্রে বন্ধনীর মধ্যেও কখনো দেখা যায়নি সেটা হচ্ছে এই যে, সুহাস করেছে বিয়ে! এ বিয়ের এক অদ্ভুত ইতিহাস আছে

যেটা আপাততঃ বলা ঘটে উঠবে না, কিংবা বল্‌লেও হয়ত' সেটা হবে অপ্রাসঙ্গিক ও একটী দ্বিতীয় সংস্করণের রামায়ণ! অদ্ভুত মেয়ে আনা। মধ্যবিত্ত আশী টাকা কেরাণীর মেয়ে হয়ে সে সৃষ্টি-ছাড়া আকাঙ্খা, শ্রেষ্ঠ পিপাসা পোষণ করতো! গুণ ছিল তার অনেক! লেখা পড়া বেশ কিছু পড়েছিল অর্থাৎ ম্যাট্রিক পাশ করে দেয় ছেড়ে, ওটাই তাদের যথেষ্ট, ওইটুকু থাকলেই তাঁরা ডেপুটীদের প্রলোভন দেখায়। তারা নাড়াচাড়া করবার চেষ্টা করে পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকের দুর্বোধ্য পুস্তক, শ', রোঁলাঁ, ওয়েলস্, কেন্ ইত্যাদি। আনার শ্রেষ্ঠ গুন ছিল তার রূপ, তার দেহ! তার অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখে, তার দেহের প্রতি স্তরের, প্রতি মাংস খণ্ডের অপূর্ব্ব গান দেখে প্রদোষও মুগ্ধ হয়েছিল তাই সুহাসকে আশ্চর্য্যান্বিত করে, সে এতোদিন তাকে পড়িয়ে এসেছে তাকে ছাড়বার স্পৃহা কখনো হয়নি। আনা প্রদোষের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি! তার জীবনের রীতিকে আঘাত দিতে একবার শুধু আনাই পেরেছিল! আনা ও প্রদোষের সম্বন্ধ শিক্ষক ছাত্রীর সীমা অতিক্রম করে বহুদিন হ'লো এমন এক রাজ্যে পদার্পন করেছিল যে রাজ্যে তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়েছিল শুধু পুরুষ ও নারী! আনা তার দেহের প্রতি রোমকূপটী বিস্ফারিত করে প্রদোষকে আকর্ষণ করেছে, ফলও পেয়েছে, তবে আশার অনুরূপ নয়! আনার সমস্ত আশা সে পূর্ণ করেছিল—পারেনি শুধু একটী, যে তাকে করলো আঘাত, যে তার নারীত্বকে রাখল অতৃপ্ত! আনার অন্তর মথিত করলে দেখা যেত যে তার বুকের ঠিক নীচের স্তরেই রয়েছে এক বাসনা যে বাসনা প্রসিদ্ধ লেখক প্রদোষকে করতে চায় স্বামী—আনা পেতে চায় প্রদোষের প্রতিচ্ছবি, পেতে চায় তার দান, তার দ্বিতীয়টি! প্রদোষ এইটীকে শৈশব থেকে ঘৃণা করে এসেছে, সে এমন পুরুষ নারীকে দেখল না যারা শুধু থাকতে চায় প্রেমিক, পুরুষ নারী, শুধু পুরুষ নারীই থাকতে চায়! সেই চিরন্তনী প্রথা!

দুদিন পরেই নারী হতে চায় স্ত্রী, মাতা! সে পেতে চায় পুরুষের বন্ধন, তার দান, তার প্রতিচ্ছবি! এই জন্য নারী কাঙ্গালিনী! এই ভিক্ষা সে যুগ হ'তে যুগান্তরে করে এসেছে বলেই আজ ইতিহাসে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার করুণ ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি, তার বুকের রক্তলিখন, তার দাসত্বের শ্রেষ্ঠ জলন্ত নিদর্শন! আনার অনুরোধ সে রাখতে পারেনি! উত্তরে সে বলেছিল যে প্রদোষ রায়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ যেখানে সেখানে হ'তে পারে না! তার দান বইবার ক্ষমতা সকলের নাই।

আনা ক্ষুব্ধ হয়েছিল—ক্রুদ্ধ হয়েছিল! সেই মুহূর্ত্ত থেকে সে প্রতিজ্ঞা করলো তার প্রতিশোধ নেবার! প্রথম সোপানে সে পদার্পন করলো সুহাসকে বিয়ে করে।

তেজস্বিণী আনা! প্রদোষ সেই জন্যই তাকে এতো ভালবাসতো! সুহাসের এ বিয়েতে প্রদোষের সামান্য মত ও ছিল না বরং ছিল সম্পূর্ণ অমত! ভূমিকাতেই সে উপসংহার লেখার চেষ্টা করেছিল! তার মতে বিয়ে করলেই ঘটবে তাদের মতির বিভিন্নতা, জীবনের ধারা নেবে অন্য গতি' তাদের কার্য্য তালিকার যাবে পরিবর্ত্তন হয়ে, সূচীপত্রে হবে পুনশ্চ লিখতে! প্রদোষ শুধু তাকে অনুরোধ করেনি, তার কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করেছিল! পূর্ব্বের ইতিহাস সুহাসকে জানিয়ে প্রদোষ বলে যে আনা আসছে সুহাসের প্রিয়া হতে নয়, স্ত্রী হ'তে নয়, সে আসছে প্রদোষের প্রতিশোধ নিতে, সুতরাং তার নিহিত উদ্দেশ্য তাকে বাধা দেবে, স্ত্রীর কাছে প্রাপ্য তৃপ্তি, কামনা, আনার কাছে কিছুই পাবে না! সে পরিস্কার জানিয়েছে যে প্রদোষের সন্তান তার চাইই—তার সন্তান ছাড়া সে পৃথিবীতে অন্য কারুর দান ধারণ করবে না! আনা আলেয়া, আনা বিভীষিকা! প্রদোষ সুহাসের দুখানা হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে বলেছিল—অতি করুণ সুরে; সুহাসকে প্রদোষ কী রকম ভালবাসত তার প্রতিধ্বনি অন্তরের গভীরতম

প্রদেশ থেকে নিজের ঝাঙ্কার শোনাল এই অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে! মানুষকে চেনা যায় না তার প্রতি মুহূর্ত্তের কথা বার্ত্তায়, ভাবভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে! সে গুলো তার বাইরের পোষাক, সমাজের অভিরুচি, সে গুলো তার সমস্যা, সমাধান নয়! যে ভাবধারা দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তার মানসিক প্রতিমুর্ত্তি, যার প্রতিচ্ছবি পড়েছে তার দেহের প্রতি রোমকূপে যার প্রতি ক্রিয়া চলছে প্রতি রক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে; এ গুলো তার স্বমার্জ্জিত সুমার্জ্জিত সংস্কার নয়, এ গুলো সুপ্ত থাকে কোন শুভমুহূর্ত্তে নিজের আত্ম পরিচয় দেবার জন্য!

"সুহাস—মেয়ে জাতকে চাই, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে নয়! যা নেবার ওদের কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় উসুল করো কিন্তু জীবন সঙ্গিনী করোনা—তা'লে কিছু পাবে না! দাম বাড়লে জিনিস খারাপ হ'য়ে যায়! সুহাস—আনাকে তুই চিনিস না! ওকে আনলে আমাকে হারাবি! বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাবায় মতো অমন চমৎকার জাত আর পৃথিবী চষেও পাবি না!"

"পাগল"—বন্ধুবিচ্ছেদের বিষয়ে নির্ভর দিয়ে সুহাস ওই কথাটা বলে ফেল্লো।

প্রদোষ কথাটা কানে তুল্লো না—প্রত্যুত্তরে একটা প্রশ্ন করলো!

"আচ্ছা সুহাস—বউ তোর কী জন্য দরকার আমাকে বলতে পারিস? সুহাস যা উত্তর দিয়েছিল সে তথ্য যে কোন দর্শনের বইএর পৃষ্ঠার অঙ্গ শোভা ও মূল্য বাড়াতে পারতো।

ঊর্দ্ধে গাঢ় নীল নীলিমার স্থির বক্ষ চিরে কোটী কোটী সূর্য্য, শত সহস্র সৌর জগৎ, বিধাতার অপূর্ব্ব ভীতিপ্রদ সৃষ্টি ছুটে চলেছে অবিরাম, অবিশ্রান্ত, সেই সৃষ্টির আদি উষা থেকে! এদের সংখ্যা অগণণ, এদের শক্তি অবর্ণনীয়, এরা এক একটী শ্রেষ্ঠ তেজপুঞ্জ! এদের মধ্যে নিহিত পৃসৃষ্টি-কৌশল এক অদ্ভুত, অশ্রুত-পূর্ব্ব তথ্য! প্রতি গ্রহ, প্রতি সূর্য্য

চক্র দিচ্ছে কোন একটী স্থির বা চলয়মান গ্রহ বা সূর্য্যের চতুস্পার্শ্বে। এইটাই এর শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। এই একটী করে আকর্ষণ আছে বলেই আজ ও সৃষ্টি আছে—নয়ত প্রতি মুহূর্ত্তে তারায় তারায় হ'তো সংঘর্ষ, শত সহস্র সূর্য্য কয়তো আত্ম গোপন নীলিমার বুকে, আকর্ষণের অভাবে এক একটী সূর্য্য ছুটে যেতো উন্মাদের মতো আঁধারের বুক চিরে উদ্দেশ্যহীনের মতো, তারা প্রতি পদক্ষেপে ঘটাতো প্রলয়, চক্ষের নিমেষে বিধাতার বিরাট অদ্ভুত সৃষ্টি চূর হ'য়ে যেতো। এই আকর্ষণই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তথ্য।

সুহাসের যুক্তি আনাকে আনবার! আনার আকর্ষণে হবে সৃষ্টি, যে সৃষ্টি চূর না হ'য়ে স্থির থাকবে।

"আচ্ছা সে আকর্ষণ কী আমি তোকে দিতে পারি না—বন্ধুর আকর্ষণকে উপেক্ষা করছিস এতোদিন পরে।"

"দুর পাগল, এতো পড়ে এই বুঝলি। আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে দূরে ঠেলবার শক্তি তোর নেই! শুধু আকর্ষণও প্রলয় ঘটায় রে তা জানিস না! আকর্ষণ, অনাকর্ষণ একই সাথে শুধু নারীই দিতে পারে! আনা নারী! তুই দুঃখ করছিস কেন? আমাদের বিচ্ছেদ স্বয়ং বিধাতাও ঘটাতে পারবে না!

প্রদোষ কোন উত্তর না দিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল।

আনা যথাসময়ে গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে তাদের দুজনারই ঘরে এলো! প্রদোষ যথাসাধ্য আনাকে এড়িয়ে চল্‌তো। অধিকাংশ সময়ই সে বাইরে বাইরে ঘুরতো, কাজে অকাজে, শুধু আনাকে এড়িয়ে চলার জন্য! ইদানিং সে আনাকে ভয় করতো মনে হতো তার অঙ্গস্পর্শ প্রদোষকে পুড়িয়ে মারবে। ওর দেহেয় যেন বিষের লেলিহজিহ্বা প্রতি রোমকূপে রোমকূপে লিক্ লিক্ করছে, তার সহস্র খণ্ডিত জিহ্বা যেন প্রদোষের দিকে

নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে! প্রদোষের মনে পড়ে যায় চন্দ্রগুপ্তের বিষকন্যার কাহিনী! এই নারী জাতি কী তারই বংশধর!

প্রত্যেকদিন ভোর থেকে রাতে শোবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনা চেষ্টা করতো প্রদোষকে জব্দ করতে, তাকে প্রলোভন দেখাতে সে তার দেহের প্রতি স্তরটাকে চাঞ্চল্যের তরঙ্গায়িত দোলায় দুলিয়ে প্রদোষের মনকে চাইতো দোলাতে, তার নারীর দেহের আকর্ষণ যতদূর সম্ভব বিস্তার করে সে চেষ্টা করতো তার শিকারকে অধিগত করবার জন্য কিন্তু আনার শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব ছিল যে বাইরের ভাব দেখে মনে হ'তো সে প্রদোষকে ঘৃণাই করে! তার এ ভাব দেখে প্রদোষ সন্তুষ্ট হতো মনে মনে তার সৃষ্টি কর্ত্তাকে অভিনন্দন জানাতো!

সেদিন ভোর বেলা তিন জনেই চায়ের টেবিলে বসেছে! ছোকরা চাকরটা চা ও খাবার দিয়ে গেল, খাবার পরিবেশন ও চা তৈরী করলো আনা নিজে; এটা নিত্য দৈনন্দিন কার্য্য তালিকার প্রথম সূচীপত্র! চায়ের টেবিলে পৃথিবীর অবান্তর তর্ক চলে অর্থাৎ প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময়কে চায়ের ধোঁয়া ও সিকরেটের ধোঁয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়! আনা ও প্রদোষের পরস্পরের কথাবার্ত্তা খুবই স্বল্প তবে সুহাসকে মধ্যম রেখে যা হয় তা একখানা আইনের বই হিসাবে আলমারীতে স্থান পেতে পারে! সুহাস উপভোগ করে! হঠাৎ সেদিন চায়ে চুমুক দিয়েই প্রদোষ গম্ভীর হ'য়ে বলে উঠ্‌লো—

"আজ কাগজে একটা দারুণ খবর—

সুহাস চোখ দিয়ে প্রশ্ন করলো চায়ে চুমুক্ দিতে দিতে!

" জাভার সমস্ত চিনির কলে ভূমিকম্প হয়েছে—

সুহাস পিয়ালায় মুখ দিয়ে হেসে ওঠে—ফলে এক ঝলক চা উৎলে পড়ে! আনা রেগে ওঠে!

কী যে করো—টেবিলের ডিসিপ্লিন জানোনা যখন তখন কুশাসনে

বসে মাটির ভাঁড়ে চা খেলেই হয়। আর কাল থেকে তোমার বন্ধুর চা তিনি নিজেই যেন ঢেলে নেন। অত চিনি মানুষে খায়—আর আমার হাতে আমার চিনি দিলেও ঐ একই অভিযোগ।

—ওরে প্রদোষ কাল থেকে তুই আনার পাশে বসিস্ স্রেফ্ চিনি লাগবে না—আর যদি এ সিফ্ খাইয়ে নিতে পারিস—হেঁ হেঁ বাবা—

ফের যারা বকছ—আনা রাগে কিন্তু এটা তার ওষুধের কাজ করে, এটা সে বোঝে—বাধা দিয়ে সে সাফল্যের স্বপ্ন দেখে!

দেখ্ সুহাস তোর কাছে আমার একটা অনুরোধ!

সুহাস চমকে ওঠে! কী রে আমায় ছাড়বি নাকি?

"তুমি আর আমাকে ছেড়েছ! তুমি আমার যম! যাক্ সে কথা নয়!" সুহাস তৃপ্তির নিঃশ্বস ফেলে।

আমাকে একটা অন্য ঘরের ব্যবস্থা করতে হয়! তোদের উৎপাতে রাতে আমার কাজ এক তিলও হয় না! তা ছাড়া একটা পরদাও তো আছে! তোদের সমস্ত কথোপকথন আমি হুবহু ভোরে হুজুরে reproduce করতে পারি, মায় ব্রাকেটে laugh pause, প্রভৃতি শব্দ এমন কী কটা চুমু খাস সে সমেৎ।

সুহাস হাসে! আনা ততোধিক গম্ভীর হয়।

"তোর হিংসে হয় শব্দ শুনে? লেখার ব্যাঘাত নিশ্চই! (একটু থেমে) তা দ্যাখ নেহাৎ অসহ্য হ'লে না হয় এসে দু একটা খেয়ে যাস্ বাপু, নয়তো আমার হজম হবে না।

"ফের যা তা বকছ! মুখ যেন একেবারে নর্দ্দমা!

তা প্রদোষ দ্যাখ কিছু না শুনলেও তুই নিশ্চয়ই এটা ভাবিস না যে আমি সমস্ত রাত আনার পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করি! স্বামী স্ত্রীরা দোরে খিল দিয়ে শোয় বলেই তারা সমস্ত রাত নিঃশব্দে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে না, দোর বন্ধ করা একটা public

advertisement! জিপসীদের দেখেছিস্, বাপ খুড়ো ছেলে মেয়ে সব শুয়ে পড়েছে উন্মুক্ত নির্ম্মল আকাশের তলে অথচ যথাসময়ে ছেলেমেয়ে হচ্ছে।

সেদিনকার যবনিকা সেখানেই পড়ে।

নারী তখনি সবচেয়ে বেশী ক্ষুন্ন হয় যখন সে পারে না তাকে আকর্ষণ করতে যাকে সে চায়! তার মনে মনে আজন্ম এমন একটা সংস্কারের ধারণা আছে যার জন্য সে ভাবে যে তার মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যেটা দিয়ে সে যে কোন পুরুষ আকর্ষিত করতে পারে। সে শক্তির যখন সে অপমান দেখে তখন তার মানসিক কার্য্য কলাপ অন্য ধারা ধরে। প্রদোষকে পাবার জন্য আনা চেষ্টার ত্রুটী করেনি, ছাত্রী হ'য়ে, সুহাসের স্ত্রী হয়ে, বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন উপায়ে, দৈহিক প্রলোভনে, অভিমানে, অনুরোধ, ভিক্ষায় তার চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। মানসিক উত্থানের কার্য্য কলাপের এমন একটা নির্দ্ধারিত স্থান আছে সেখানে পৌছলে সে থমকে দাঁড়িয়ে নিজের কার্য্য তালিকা একবার পর্য্যবেক্ষণ করে, তারপর আরম্ভ হয় তার প্রতিক্রিয়া! আনার এই প্রতিক্রিয়ার সময় এসেছে! আসতে বাধ্য হয়েছে! এতোদিন প্রদোষের আশায় সুহাসের কাছেও সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দেয়নি সহস্র উপায়ের অছিলায় সে সুহাসকে বঞ্চিত করেছে, স্বামী হয়ে সুহাস আনার দেহ একদিন স্পর্শ করতেও পায়নি! একাধিক রাতে একজন পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীর শয্যায় শুয়ে এমন সন্ন্যাসীর জীবণ পালন করা এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। আনাকে সুহাস অদ্ভুত, অবর্ণনীয় ধারনা করে রেখেছিল! তাকে সে পেয়েছে এই ভাগ্যলাভেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান মনে করতো, অধিকন্তু বিশেষ কিছু অত তাড়াতাড়ি আশা করার সাহস তার ছিল না! ভিক্ষা যে সে করতো না তা নয়, করতো, প্রতি মুহূর্ত্তে সে আনার কাছে ভিক্ষা করতো, পুরুষ নারীর কাছে যা কিছু পেতে

পারে সুহাস আনার কাছে প্রতি মুহূর্ত্তে ভিক্ষা চাইতো! আনা তাকে দুঃখ না দিয়ে সুন্দর ভাবে অপেক্ষা করবার জন্য বুঝিয়ে দিয়েছিল কী করে বুঝিয়েছিল তা আনাই জানে।

আনা! হতাশ আনা! সত্যিই সে এতোদিন সুহাসকে ভাল বাসেনি, ভালবাসার সময় পায়নি, প্রতি মুহূর্ত্তে তার মন, তার দেহের প্রতি রোমকূপ উন্মুখ হয়ে আকর্ষণ করতো প্রদোষকে; সত্যি সে সুহাসের কথা একবারও ভেবে দেখেনি! ভেবে দেখার তার অবসর ছিল না বলেই ভেবে দেখেনি। রাতে সে বাস্তবিক ভাবে শুয়ে থাকতো সুহাসের পাশে, কিন্তু কাল্পনিক ভাবে থাকতো প্রদোষের। দেহ ও মনের মধ্যে যদি মন বেশী প্রতিপত্তি পেতে পারে দেহের ওপর, তবে আনা থাকতো প্রদোষের শয্যায়! পাশের ঘরেই প্রদোষ, তার ঘরে প্রতি শব্দটা আনাকে সচেতন করতো! বহুরাত পর্য্যন্ত প্রদোষ তার ঘরে বসে লেখা পড়া করে, যতক্ষন সে না শোয় ততক্ষণ আনা জেগে থাকে, জেগে থাকে, ভাবে আর ব্যথা পায়। প্রদোষ কী করছে? লিখছে? কী করে লেখে এতো! এইগুলোই দেখতে দেখতে পত্রিকায় প্রকাশ পাবে, দেশ বিদেশে লোকে পড়বে, সমালোচনা করবে, প্রশংসা করবে, নিন্দা করবে, তড়িৎ বার্ত্তার মতো তার যশ যাবে দেশ হতে দেশে প্রদেশে প্রদেশে! এইতো তারই পাশের ঘরে সে গুলোর সৃষ্টি হচ্ছে! যদি আনার নিজের ঘরেই হ'তো! উঃ সত্যি কী আনন্দ। (আনার চোখ উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে রোমাঞ্চ হয়) এই তো আনা শুয়ে আছে, প্রদোষ লিখছে! "এখন শোওনা, অনেক রাত হয়েছে, রাত কী এম্নি বসেই কাটাবে, আমার বাপু তোমার পাশ না পেলে ঘুম হয় না, (আনা আহ্লাদে সুহাসের একখানা হাত তার বুকে আপ্রাণ চেপে ধরে একটা সুঅনুভূতিতে সুহাসের ঘুম ভেঙ্গে যায়; আনা নিজেতে ফিরে এসে তার হাতখানা অবজ্ঞা করে ছুড়ে ফেলে দেয়!) প্রদোষের ঘরে চেয়ারের

শব্দ হয়, এখনো তা'লে জেগে আছে! আনা চুপি চুপি সুহাসকে কী বলে, সুহাস আনাকে দুটো চুমু খায় সশব্দে, প্রদোষের ঘর থেকে সে শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। এতেও কী তার মনে হিংসা হয় না, ইচ্ছে হয় না! সুহাসকে যে সশব্দে চুমু খেতে এই গভীর রাতে অধিকার দেয় তার অন্তরালে এক গভীর উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিদিন থাকে! তা' না হ'লে বোধ হয় সুহাস এতেও বঞ্চিত হ'তো।

প্রদোষ বারান্দায় পায়চারি করে গভীর রাতে এটা তার দৈনন্দিন ব্যাধি! এই পায়চারিটুকু করেই সে শুয়ে পড়ে! এটা তার সঠিক কার্য্য তালিকা! আনার কণ্ঠস্থ প্রদোষের দৈনন্দিন প্রত্যেকটী কার্য্যসূচী।

"কীরে সুহাস ঘুমলি?" প্রদোষ বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করে! ঘুমন্ত সুহাস উত্তর দিতে পারে না! আনা নিঃশব্দে লাফিয়ে ওঠে যাবার সময় ব্লাউজটা চট্ করে খুলে রেখে যায়! পশ্চিমের চাঁদের আলোর এক ঝলক এসে পড়েছে তাদের ঘরের দেয়ালে লুটিয়ে। আনা বাইরে আসে, অসংযত বস্ত্র, বক্ষ সম্পূর্ণ নগ্ন! নারী আনা দরজা খুলে ঠিক প্রদোষের সম্মুখে আসে, প্রদোষের মুখে পড়েছে এক ঝলক চাঁদের আলো, কী সুন্দর মুর্ত্তি, যেন বিধাতার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি! সুপুরুষ প্রদোষ!

"কেন কিছু দরকার আছে?" প্রদোষ আনাকে দেখে থমকে দাড়ায়, চাঁদের আলোতে আনাকে অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে, তার অঙ্গে চাদের অলোর লুকোচুরি! আনার একী বেশ! প্রদোষের মাথায় এক ঝলক রক্ত বেগে প্রবেশ করে! নিজেকে সে সংযত করে কোন প্রকারে।

না কোন দরকার নেই এম্নি! প্রদোষ নিজের ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ করে ফেলে! আনা বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়ে, রাগে, অভিমানে, ফুলে ওঠে অবশেষে কেঁদে ফেলে।

ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করাতে আনার আসে প্রতিক্রিয়া! সে

এখন প্রদোশকে যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। সকালে চায়ের টেবিলে আর সে যোগ দেয়না প্রায়ই কোন কাজের অছিলা দেখায়! আনা যথেষ্ঠ করেছে, তার চেষ্টা তার মানসিক ক্রিয়া একটা কোন বিশেষ স্থানে পৌছিয়ে এখন বাধ্য হ'য়ে বিপরিত মুখী হয়েছে এবং তার ক্রিয়া চলেছে দ্রুততর! প্রদোষের চেহারা এখন তার কাছে অসহনীয় বোধ হয়, তার সামনে আসলে আনার মনে হয় কে যেন তাকে তার সর্ব্বাঙ্গে কশাঘাত করছে, তার অঙ্গে প্রতি স্তরে স্তরে যেন বিষের তীব্র দহন! সে দহন তাকে শান্তি দেয়না এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, সে দহন তার বুকের মধ্যে যেন কাল বৈশাখীর চাঞ্চল্য উপস্থিত করে! কেন? কেন? কেন তার এতো অহমিকা! রূপের জন্য সৌভাগ্যবান কী পৃথিবীতে সে একা? আনার কম কিসে? যৌবন প্রকাশের প্রথমদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আনার প্রতি মুহূর্ত্তের কথা মনে পড়ে যায়, তার দেহের প্রতি স্তরের প্রশংসা করেছে শতশত প্রলুব্ধ যুবক, যারা পেতে চেয়েছে মুহূর্ত্তের জন্য তার সঙ্গলাভ, তার মুখের সামান্য একটু হাসি, তার অনাবৃত হাতের তরঙ্গায়িত একটা দোলা, তার দেহের স্পর্শ লাভে শরীরময় এক অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ! আনা খেলেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাদেরকে খেলিয়েছে! তার দেহ পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! লেখক! লেখক! কী হয়েছে সে লেখক সে জন্য! যশ্ খ্যাতি কী পৃথিবীতে কেও আর ইতিপূর্ব্বে পায়নি? তাদের কী স্ত্রী ছিল না? তাদের কী সন্তান ছিল না? "প্রদোষের দান ধারণ করবার শক্তি পৃথিবীতে যার তার নেই" তার কথাগুলো একটা তড়িৎ প্রবাহ জাগিয়ে তোলে তার স্মৃতি পটে! না! প্রদোষের দান যেন পৃথিবীতে এক বিরাট সৃষ্টি হবে, সে যেন হবে এক বিধাতা অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি! পৃথিবীতে সমস্ত মণীষির সন্তান হয়েছে তাদের প্রতিভার, অবর্ণনীয় সৃষ্টি শক্তির এক হাস্যকর কুৎসিৎ সংস্করণ! প্রতিভার সন্তান নেই; তার আংশিক বিকাশ তার অপমান মাত্র! রবীন্দ্র নাথের সন্তান না থাকলে

পৃথিবী খুসী হ'তো রবীন্দ্রনাথও! শ' ভাগ্যবান! Superman গড়তে বাঁদর হ'তো নিশ্চয়ই! ঐ তো বসে লিখেছে, জানালা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে, এক মনে ঘস্ খস্ করে খানিক লিখে যায় আবার উদাস চোখে জানালা দিয়ে অপর দিয়ে তাকায়! সত্যি চোখ দুটো খুবই ভাল যেন অভ্যন্তর দেখার শক্তি আছে, সমস্ত চোখময় ছড়ান একটা তীব্র মাদকতা, আবেশ বিহ্বল চাউনি, ওর নেশা আছে, ও পাগল করতে পারে! আনা সেখান থেকে সরে যায়।

এই রকম ছাড়াছাড়ির একটা আকর্ষণীয় শক্তি আছে সে কাজ করে যায় নিঃশব্দে সকলের চোখের অন্তরালে! আনা ও প্রদোষের মধ্যে এমন একটা কার্য্য দ্রুততর চলছিল যেটার সম্বন্ধে তারা দুজনে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! প্রদোষের দিন কাটছিল তার খেয়ালমতো! সম্প্রতি তার কী একখানা উপন্যাস প্রকাশিত হওয়াতে দেশময় পড়ে গিয়েছে এক বিরাট চাঞ্চল্য, যে চাঞ্চল্য করেছে তাকে চঞ্চল, কাগজে কাগজে প্রতিবাদ, পত্রিকায় পত্রিকায় সমালোচনা, প্রশংসা, নিন্দা, বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশকের কাছ থেকে আসছে তার ইংরাজি অনুবাদের সানুনয় অনুরোধ! প্রদোষ ব্যস্ত! আনার কার্য্য কলাপের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখার সময় তার বিন্দুমাত্র ছিল না! আনার প্রতি এই উদাস ভাব তাকে আরো চঞ্চল করেছে; আনারই এত মত্ততা কিসের? সকাল থেকে আরম্ভ করে যতোক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ শুধু প্রদোষেরই কথা ঘুরে ফিরে তার মনে আসে কেন? তাকে ভুলতে চেষ্টা করতে গিয়ে কী শেষে বিপরীত ফল দাঁড়াবে! টেবিলে সে চা পরিবেশন করবে কিন্তু সেখানে স্থান নেবে না, খাবার সময় তদারক করবে কিন্তু নিজে মুখফুটে জিজ্ঞাসা করবে না। দুপুরে যখন সুহাস তার অফিস চলে যায় তখন আনা প্রদোষের কাছে কোন কথা বলতে চাইলে চাকরের সাহায্য নেয়! রাতে শোবার সময় এক গেলাস জল

প্রদোষের ঘরে রাখা দৈনন্দিন কার্য্য তালিকার অন্যতম, এটা আনা নিজে হাতে করতো; মাঝে চাকরকে দিয়ে করাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু একদিনের একটা ব্যাপারে সে কাজটা আবার নিজের হাতে তুলে নিতে হ'লো! চাকরটার কী? ওর কী আর মায়া দয়া আছে? মাইনে করা লোকের ওই মাহাত্ম্য! জলটা রেখেছিল তা সেটাকে ঢেকেও রাখেনি! কেন! আনা কেন করবে? কিসের স্বার্থ তার? অত আত্মভোলা লোকদের এত অহঙ্কার কিসের, এত সচেতন বুদ্ধি কেন? তাদের একটা বিয়ে করা উচিত! বিয়ে করবো না অথচ তার সুবিধাটুকু ষোল আনা চাই! আনার কী দরকার? সে করবে না, সে করবে না! প্রদোষ তার কে?————আনা তবুও তার সখের সব কাজ করে।

পরিপূর্ণা বর্ষায় নদী পায় তার পূর্ণ যৌবন, তার শক্তি হয় দ্বিগুন, সে হয় খরস্রোতা! তীরে সুউচ্চ বেলাভূমি দাড়িয়ে থাকে যেন যৌবনমত্ত পুরুষ! তার পায়ের নীচে কলকণ্ঠে গেয়ে যায় নারী নদী—তার পা ধুইয়ে পূজো করে; গর্ব্বিত পুরুষ! কিন্তু এমন একদিন আসে যখন উচ্চ তীরের অন্তরে হয় খাদ, হয়তো বা কোন গোপন রাতে লোক চক্ষুর অন্তরালে শুধু নদীরই বুক মথিত করে তার হয় পতন; তার পৃথক অস্তিত্ব মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সে এক রাত! পৃথিবীর অগণণ রাতের একটী, তার মূল্য সমগ্র সৌর জগতের কাছে নগণ্য।

রাত তখন কটা ঠিক বলা কঠিন! প্রদোষ কিছুক্ষণ আগে শুয়েছে, ঘুম আসেনি—অর্দ্ধ সমাপ্ত গল্পের নায়ক নায়িকা তখনো তার চোখের সামনে বিভিন্ন রূপে ফুটে উঠ্‌ছে, তারা তখনি মুক্তি দাবী করছে! এখন আর সে পারবে না কলম ধরতে—মাথাটার মধ্যে টন্‌টন্ করছে; শ্রান্তি; এই মুহূর্ত্তে কী যেন একটা তৃপ্তি আবশ্যক! প্রদোষ আশৈশব

অনেক পুরুষকে বলতে শুনেছে যে নারী ছাড়া জীবন নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়, জীবনে এমন কোন মুহূর্ত্ত আসে না যখন নারীকে চাই ; তারা কথাগুলো বলে যেন কতো বড় সব চৈতন্য মহাপ্রভু ! প্রদোষ তাদেরকে ঘৃণা করে,—হয় তারা শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী, শ্রেষ্ঠ হীন চরিত্রবান কিংবা জীবনে সে সব মুহূর্ত্ত কখনো পায়নি যখন নারীকে নিতান্ত আবশ্যক ! প্রদোষ আর পারে না, কল্পনা জগতের জীবগুলো তাকে ব্যস্ত করে তোলে, তাকে যেন পেয়ে বসেছে, তার বাস্তবের মাধূর্য্যটুকু বোধ হয় মারা গেলো কল্পনার পীড়নে, কোন কোন মুহূর্ত্তে ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন নিছক বাস্তব নিয়ে কাটাতে ইচ্ছা করে, কঠিন, নগ্ন, রূঢ় সত্য বাস্তব ! আনা ! আনা ! ওতে যেন কল্পনা ও বাস্তবে কোলাকুলি হয়েছে, কী সুন্দর মহামিলন, আনা বাস্তবিকা ! এই তো পাশের ঘরে—কী করছে ? হয়তো ঘুমচ্ছে, অসংযত বস্ত্র, লীলায়িত দেহ, প্রসারিত বাহু, লোভনীয় দেহ। সত্যি আনার দান সে দুহাতে ঠেলেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে সে এনেছিল তার পূর্ণ অর্ঘ, মিনতিপূর্ণ দুটো চোখ বিশ্ব লোভনীয় দেহ, প্রদোষ সব উপেক্ষা করেছে ! কেন ? সে এমন কী সৃষ্টি ছাড়া পুরুষ, তার এতো স্বার্থপরতা কিসের। আনা ইচ্ছে করলে পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বরণ করে নিতে পারতো। প্রদোষের মন দ্বিধা হয় এক অংশ সাময়িক যুদ্ধ ঘোষণা করে তার চিরন্তন অপরাংশের বিরুদ্ধে। সাময়িক শক্তিই অধিকাংশ স্থানে জয়লাভ করে, তার সৃষ্টিছাড়া শক্তি, জয়ের অবর্ণনীয় লালসা, গ্রাসের শত সহস্র লেলিহান জিহ্বা। এই সাময়িক স্পৃহা প্রদোষকে পরাজিত করেছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে,—সেই মুহূর্ত্তে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আনা যদি তাকে উপহার দিতে চাইতো সে নিতো, দুহাত পেতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুকের মতো নিয়ে, শ্রেষ্ঠ নৃপতির মতো ঐশ্বর্য্যশালী হ'তো। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রদোষ শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুক, বিশ্ববিখ্যাত কাঙ্গাল। আনা ! আনা ! তুমি কোথায় ?

এই মুহূর্ত্তে তোমার উপহার দিয়ে আমাকে ধন্য করো, আমার দৈন্য, আমার নিঃস্বতা দূর করো। দেরী হ'লে প্রদোষ রায় আবার তার পুরোণ খোলসে নিজেকে জড়িয়ে মিথ্যা পরিচয় দিতে পারে, এসো—এসো, এক্ষুনি, ঠিক এই মুহূর্ত্তে—নিঃশব্দে গিয়ে তাকে ডেকে আনবো? সুহাস ঠিক্ ও পাবে না। যে ঘুমপ্রিয় সে। আনা অচেতন হ'য়ে ঘুমুচ্ছে, না ডেকে আনলে সে জানবে কি করে', তার কী দোষ। অথচ মুহূর্ত্ত চলে যায়। নাঃ—আর পারিনে—

—খট্!—

কে? তবে কী—! টক্! সুইচ টেপার শব্দ। আনা! আনা! উদ্ভাসিত আলোকে আলোকময়ী আনা। একী বেশ। প্রদোষের মাথা চন্‌চন্ করে ওঠে। নারী আনা। বিশ্ব বন্দিতা নারী।

"আনা—তুমি? এতো রাতে কী চাও আমার ঘরে! সুহাস জানতে পারলে কী ভাববে বলতো? যাও—চলে যাও! আবার এসেচ?"

নিরুত্তর আনা তর্জ্জনী স্থাপন করে লালসাসিক্ত অধরের ওপর—অর্থাৎ আস্তে! সে যেন খিপ্তা! সুহাস! সমস্ত জগত ও বাধা দিতে পারবে না। তার শেষ চেষ্টা।

আনার চোখ যেন জ্বলছে, ওতে আছে লালসার গগনচুম্বী অগ্নিশিখা এই মুহূর্ত্তে ও গ্রাস করবে।

আনা নিঃশব্দে এসে প্রদোষের পাশে শুয়ে পড়লো, প্রদোষ উঠ্‌তে গেলে আনা তাকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের মধ্যে! উঃ কী প্রচণ্ড শক্তি।

"প্রদোষদা—আর বাধা দিও না! কেন মিছে গোলমাল করবে?

প্রদোষ কী রকম যেন হ'য়ে যায়! চট্‌করে সুইচটা অফ্ করে দেয়। অন্ধকারে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে আনাকে।

সে রাতে আনা তার শ্রেষ্ঠ দান পেলো।

এক গভীর রাতে লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রদোষের সুউচ্চ অহমিকা তলিয়ে গেল আনার অতল যৌবনের তলে।

পরের ঘটনা খুবই অপ্রত্যাশিত! হঠাৎ—খুবই হঠাৎ, ঠিক যেন অকারণে সুহাস গেল মারা। সুহাসের মৃত্যু আনাকে স্পর্শ করলো না, করতোও না—তবে আশ্চর্য্য এই যে প্রদোষকেও কিছুমাত্র স্পর্শ করলো না! যেন কিছুই ঘটেনি—কিংবা যা ঘগেছে সেটা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত।

যে নীড় আনা বেঁধেছিল তার কোন উচ্ছৃঙ্খলা হ'লোনা, তার দৈনন্দিন কার্য্য তালিকার কোন ব্যতিক্রম হ'লোনা, অর্থাৎ সুহাসের মৃত্যু শেষ পর্য্যন্ত এক খণ্ড ছায়াও রেখে দিতে পারেনি! বরং আনার কী যেন একটা অন্তরায় অপহৃত হয়েছে, কী যেন একটা পেয়েছে যেটা ছিল তার শ্রেষ্ঠ অভাব যার আগমনে তার শূণ্য বন্ধনী পূর্ণ হয়েছে একটা অতি সুন্দর শব্দে। আনা আরো সুন্দর হয়েছে, পায়ের রক্তিম নখর থেকে বঙ্কিম ভ্রূ পর্য্যন্ত সে হয়েছিল অনিন্দিতা। ঋতু উৎসবে লব্ধ যৌবনা লতিকা! তার প্রতি রোম কূপে কূপে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আনন্দ ও উৎসবের ঘোষণা। পাওয়ার আনন্দ তাকে যেন আগের থেকেও বেশী চঞ্চলা করে তুলেছে। ভোর থেকে রাত পর্য্যন্ত সে অবিরাম কাজ করে চলেছে, সর্ব্বদা মুখে এক টুক্‌রো হাসি নিয়ে সে প্রদোষের পরিচর্য্যা করে, প্রতি মুহূর্ত্তে আসে তার ঘরে, অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, সৃষ্টিছাড়া উত্তর, নারীসুলভ চঞ্চলতা যেন ছোট্ট একটী মেয়ে।

প্রদোষ! সুহাসের মৃত্যু যেন ক্রমে ক্রমে তাকে ছেয়ে ফেলছে তার কালো ছায়ায়; প্রথমটা এমন ভাব দেখিয়েছিল যেন কিছুই ঘটেনি যা তাকে স্পর্শ করতে পারে! দিন যায় আর প্রতি মুহূর্ত্তে সে যেন নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকটী জিনিসের ওপর যেন

ফুটে ওঠে মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা বিকৃত কালিমাচ্ছন্ন সেই মুখখানা। উঃ কী ভীষণ দৃশ্য! থেকে থেকে যেন একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ দুটী ঠোঁটের চাপে পড়ে নিষ্পোষিত হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কপালে ফুটে উঠ্ছে কতকগুলো মোটা মোটা শিরা, সুন্দর মুখখানা কালো হয়ে এমন একটা বিকৃত ভাব ধারণ করছে যেন ও এই মুহূর্ত্তে মৃত্যু চায়। "প্রদোষ আর পারিনে ভাই—কী হ'লো আমার। একটু বিষ এনে দিতে পারিস? এ যন্ত্রণা আর পারিনে সহ্য করতে!—" কী রকম ভাবে যেন প্রদোষের দিকে চায়! সম্মুখে আয়না থাকলে প্রদোষ দেখতে পেতো যে তার মুখ তার নিজের মুখ নয়, তাকে যেন ভূতে ধরেছে, গুরুতর একটা অপরাধে যেন সে অপরাধী! পৈশাচিক দৃষ্টিতে পাশে আনার দিকে চায়। ধীর, স্থির ওর চোখ দুটো। কিছু যে হারাচ্ছে সে ভাবই যেম ওর মুখে এক বিন্দুও নেই। কিছু সামান্য হারিয়ে যেন ও অসামান্য কিছু পাচ্ছে। যা পেয়েছে কিংবা যা পাবে তারই একটী অত্যুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি ওর চোখে, ওর মুখে! প্রদোষ হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, পর মুহূর্ত্তে আবার সুহাসের মুখের দিকে। এই নারী—! পৃথিবীতে এমন কোন অপরাধ নেই যা নারীর দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে না; সুহাস! সুহাস! শৈশবের অর্দ্ধবিস্মৃত দিন থেকে আরম্ভ করে, স্কুল, কলেজ, প্রত্যেক দিনটী যেন তার চোখের সামনে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে—কত কথা, অগণণ কল্পনা, অসংখ্য জল্পনা, বিচিত্র ভবিষ্যৎ ছবি। প্রত্যেকটী যেন আজ তার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠ্ছে। সুহাস তাকে কী ভালটাই বাসতো। মেশের প্রত্যেকটী দৃশ্য যেন আজ জীবন্ত হয়ে উঠ্ছে, একজন উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে যেমন মা বুক দিয়ে করে, তার শত সহস্র দোষ তার অগণণ অপরাধ মুহূর্ত্তে ভুলে গিয়ে বুকে জড়িয়ে নেয় সুহাস ঠিক তাকে সেই রকম ভাবে ভাল বেসেছে। মার ভালবাসা। স্বার্থপর পিতার নয়। তার কী এই পরিণাম—এই কী তার পুরস্কার।

আবার আনার দিকে চায়। কী সুন্দর। আনা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী! মনে পড়ে যায় সেই রাতে সুমধুর স্মৃতি। উঃ—সে কী উপভোগ। এখনো যেন সে সেই অনুভূতি পাচ্ছে।—আনা—এইতো সেই আনা। একে চাই—প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি রাত্রে আবশ্যক। সুহাস থাকলে ত'—! কণ্টক।

"প্রদোষ! ভাই! একটু বিষ এনে দিতে পারিস—?" বিকৃত মুখখানা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। উঃ! সে মুখখানা যেন বিশ্রী অট্ট হাসি হাসছে। সুহাসের কণ্ঠস্বর যেন সর্ব্বদা তার কানে আসতো! "প্রদোষ। আনা তো তোরই জিনিস আমি চেয়ে নিয়েছিলাম—আবার চেলেই ফেরৎ দিতাম। তার জন্য তুই—প্রদোষ যেন আর শুনতে চায় না, দু আঙ্গুল দিয়ে কান বন্ধ করে! সুহাসের শুধু মুখখানা যেন সদা সর্ব্বদা তাকে ঘিরে আছে, রাতে যেন সর্ব্বদা তার মুখের ওপর ঝুঁকে থাকে, পাশে আনা শুয়ে থাকে, হঠাৎ কখনো কখনো যেন কে ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, তাকিয়ে দেখে ঠিক খাটের পাশে দাড়িয়ে সুহাস, সহাস্য মুখ স্থির হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে; হঠাৎ আনার দিকে তাকায় আর সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা ঠিক সেই রকম বিকৃত হয়ে ওঠে। উঃ! কী ভীষণ চেহারা। প্রদোষ চমকে ওঠে—ভয়ে জড়িয়ে ধরে নিবিড় ভাবে আনাকে। আনার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

"কী আবার ভয় পেয়েছ তো। ছেলেমানুষ। এই তো আমিই কাছে রয়েছি—আমাকে ছুয়ে শুয়ে থাকো দেখি—কিস্সু হবে না—" আনা তার একখানা হাত নিজের নগ্ন বুকে গভীর ভাবে চেপে থাকে। আঃ—প্রদোষের চোখ বুজে আসে। প্রদোষ যেন একটা ভীষণ অট্ট হাসি শুনতে পায়। হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে তার কানে কে যেন বলে—

"কী নরম—নারে? আমি শালা কিন্তু—প্রদোষ শিউরে ওঠে। পর মুহূর্ত্তে বোঝে ওটা আনারই নিঃশ্বাস তার কানে লাগছিল। আনার

স্পর্শ নিবিড় ভাবে সুহাস কোন দিনই পায়নি। এ আক্ষেপ ওর এখনো আছে বোধ হয়।

প্রদোষ অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। লেখাপড়া এক রকম বন্ধই। ছায়া দেখেই চমকে ওঠে। প্রতি মুহূর্ত্তে সুহাসের অশরীরী আত্মা যেন ওর পিছু পিছু ঘুরছে। প্রতি মুহূর্ত্তে যেন সে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে—"প্রদোষ—আমি কী তোর কণ্টক ছিলাম! তোর ছেলেকে আমায় দিস্।"

ডাক্তারে বল্লো স্থান পরিবর্ত্তণ করতে। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হচ্ছে দেখে আনা তার সম্পূর্ণ মত দিল! প্রদোষও যেন এ বাড়ী ছাড়তে পারলে বাঁচে।

স্থির হ'লো পূর্ণিয়া যাবে। বহুদিন পরে নিজের বাড়ীতে। প্রাণটা সত্যিই নেচে উঠ্‌লো। তার মার স্নেহসিক্ত মুখখানা ভেসে উঠ্‌লো—

"পাগলা—তোর এক গুয়েমির কী কোন মূল্য আছে। হ্যাঁরে আমাকে কাঁদিয়ে কী তোর আনন্দ হয়! একে! বৌমা! বাঃ কী সুন্দর মুখখানা রে, যেন স্বয়ং মা লক্ষ্মী।"

ভোর হ'তে তখনো বেশ খানিকটা বাকী; গাঢ় অন্ধকার, বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের কোন রাত। গঙ্গার বুক মথিত করে ষ্টিমার ছুটে চলেছে—যাত্রীরা সকলেই যে যার মতো একটু ঘুম দেবার সুখটুকু আঁকড়ে ধরেছে, এটা এ দেশের বৈশিষ্ট! জেগে শুধু ষ্টিমারের চালকরা, যারা ঘুমতে পারে না। নিঝুম। স্থির স্তব্ধতা। শুধু ষ্টিমারের চলার শব্দ, জলের ছলাৎ ছলাৎ, সব মিলিয়ে যেন অপূর্ব্ব ব্যাপার করে তুলেছে। মনিহারী ঘাটে পৌছাতে এখনো ঘণ্টা দেড়েক। কেবিনে আনা ডেক চেয়ারে খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছে। প্রদোষ জেগে অবান্তর চিন্তা করছে। জানালা দিয়ে নদীর বুকের আলো গুলো যেন হাতছানি দিচ্ছে। ওখানে অথৈ জল—ওরা ডুবিয়ে মারবে। হাসছে—কী পৈশাচিক হাসি। ওকী? জানলায় সুহাস কেন? উঃ—কী বিশ্রী মুখ, সেই বিকৃত ভাব!

স্থির চোখে নিদ্রিতা আনার দিকে চেয়ে। ওর খুব ইচ্ছাছিল ও 'বাবা' হোক। ওর ঐকান্তিক ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি! "হ্যাঁরে প্রদোষ—আনার নাকি ছেলে হবে—আমাকে ও ফাঁকি দিয়েছে—"

প্রদোষ চমকে ওঠে! আনাকে ধাক্কা দিয়ে তোলে! "কী? মনিহারি এলো?"

"না এখনো ঢের দেরী—এক কাপ চা ঢাল দেখি!—গলাটা শুকিয়ে আসছে।"

দুজনেই চা খায়।

"—চলো একটু বেড়িয়ে আসি, কী সুন্দর journey তা তো দেখলে না, শুধু ঘুমই দিতে পার—"

"ঘুমতে আর দিলে কই,—চল! আচ্ছা পূর্ণিয়ায় নাকি ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বর—আচ্ছা, হ্যাঁ, ভাল ডাক্তার পাওয়া যায় তো? নাকি? লেডী ডাক্তার আছে?

প্রদোষ সেই দুঃখেও একটু হাসে! অজাত সন্তানের জন্য মার এখন থেকেই কী আকুল শুভাকাঙ্খা।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—সব পাওয়া যায়—শুধু মানুষেরই অভাব! ভূমিকম্প না হ'লে পূর্ণিয়া দশ বছরে একেবারে—

তারা দুজনা রেলিং এরধারে এসে পড়েছে! রেলিং ভর দিয়ে দাঁড়াল! পাশাপাশি! আনার একখানা হাত প্রদোষের কোমরে জড়ান, প্রদোষের একখানা তার গলার ওপর দিয়ে বুকের ওপর এলিয়ে পড়েছে! দূরে অবিশ্বাসী অন্ধকার, অজ্ঞাত ওর অন্তর, ভীতপ্রদ ওর বহির্ভাগ! আলো গুলো টিপ্ টিপ্ করছে! চাকায় কেটে জল গুলো আরো শক্তি পাচ্ছে কী বিরাট ঢেউ! নির্জ্জন স্থান—ষ্টিমারে সে অংশে কেউ ছিল না! সার্চ লাইট ঘুরে ফিরে এক এক জায়গায় পড়ছে, ওর বিরাট আলোর স্তম্ভের ভেতর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা স্নান করছে! মাঝে মাঝে এক

একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে! আনার চুলগুলো উড়ে এসে মাঝে মাঝে প্রদোষের গায়ের ওপর পড়ছে, আঁচলখানা উড়ে কখন পড়ে গেছে—সে খানা আর তুলে নেবার প্রয়োজন হয়নি। এই তো তার পাশে আনা! হঠাৎ সুহাসের মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌লো! উঃ কী ভীষণ অতৃপ্তি! আনা! আনা! তার ছেলে! প্রদোষের মাথাটা ঘুরে উঠ্‌লো! মনে পড়ে গেল সুহাসের ভালবাসা। একটা মার মতো সে তাকে সেবা করেছে, সেই অদ্ধ বিস্মৃত শৈশব থেকে শেষদিন পর্য্যন্ত কী ভালটাই বেসেছে—প্রদোষের লেখাকে সে কী শ্রদ্ধার চোখেই দেখতো—তার কী উৎসাহ! আজ প্রদোষ রায়ের নামই বা কে জানতো সুহাস তাকে সাহায্য না করলে! সেই সুহাসকে কি না একটা সামান্য নারীর জন্য শেষে নিজে হাতে বিষ—আনার পরামর্শে! প্রদোষ হিংস্র চোখে আনার দিকে চায়! আনা চেয়ে বলে—কী দেখছ? অন্ধকারে আমাকে কতখানি সুন্দর লাগে! আচ্ছা বলতো খোকার নাম কি রাখবো—

প্রদোষের মাথাটা যেন কী রকম হয়ে যায়! হঠাৎ রড্‌টা খুলে তাকে ভীষণ জোরে এক ধাক্কা দেয়—চীৎকার করে বলে "রাক্ষস!"

ঝপ্‌

জলে একটা শব্দ।

বহুদূরে একটা লাল আলো দেখা গেলো! সুহাস হাসছে, কী তৃপ্তির হাসি।

প্রদোষ স্থির চোখে একবার কী যেন খুঁজলো গঙ্গার বুকে! সব অন্ধকার।

—০ঃঃ(*)ঃঃ০—

ইহাদেরি ঘিরি'
ঘুরিছে পৃথিবী।

শিল্পীর স্থান কবির চেয়ে অনেক উচ্চস্তরে! শিল্পী, কবি ও শিল্পী একাধারে দুই! দুজনেই ছবি আঁকে একজন ভাষায়, একটার পরে আরেকটার শব্দ বিন্যাসের অপূর্ব্ব সমন্বয়, ভাষায় সকলের, শব্দ প্রত্যেকের, অর্থ চিরন্তনী তার কুশলতা শুধু সেগুলোর জায়গা বুঝে সাজিয়ে যাওয়া। সকলে পারে না এটা মানি কিন্তু চেষ্টা করলে প্রত্যেকেই খানিকটা কাব্য লিখে ফেলতে পারবে, কবিতা না পারলেও, বিশেষতঃ বাঙ্গালী। শিল্পীর কার্য্য কুশলতা অন্য প্রকারের সে যা করে সেটা চেষ্টা সাধ্য সম্পূর্ণ নয়, কিছু বীজ থাকা চাই! তার তুলির প্রতি রেখায় ফুটে ওঠে এক একটী কবিতা, তাদের সমন্বয়ে ফুটে ওঠে কাব্য। তার সৃষ্টি কবিতা, কাব্য, ছবি। বাস্তবের সঙ্গে গূঢ় ও নিবিড় সম্পর্ক কবির চেয়ে বহুগুণে বেশী শিল্পীর, তাই সে সত্য তাই সে বহু উচ্চে! যে কবি বাস্তবকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করে সে শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ কবি নয়।

প্রবীর শিল্পী। পশ্চিমের বারান্দায় বসে সে সম্মুখীন অস্তগামী সূর্য্যের শেষ খেলা দেখছিল। সূর্য্যের এটা পরাজয় তা সে স্বীকার করতে পারছিল না, এটা সূর্য্যের শ্রেষ্ঠ জয়। রক্তিম আভা যেখানে প্রস্ফুটিত হয় সেটা জয়েরই নিদর্শন। ও রংটা জয়ের বিজয় পতাকা। মিলনের

শ্রেষ্ঠ প্রমান প্রস্ফুটিত হয় রক্তিম বর্ণের ছটায়। দুয়ের মিলনের ফল রক্তিমতা। দীপ্ত সূর্য্য উদয় হয় উষার বুকের আঁচলের তল থেকে, অনাবৃত করে তার নগ্ন বক্ষ, তার যৌবনের প্রতি স্তরে স্তরে প্রতিফলিত করে নিজের প্রখর রৌদ্রতাপ, অসহনীয় হওয়ায় কুমারী উষা করে ত্যাগ তার দীপ্ত প্রেমিককে! পুরুষ সূর্য্য ভ্রূক্ষেপও করে না তার দিকে, দীপ্যমান তেজস্কর সম্পূর্ণ দিন নিজের কর্ত্তব্য সমাধান করে, পৃথিবীর কত শত শত সুন্দরীর অবর্ণনীয় যৌবনের সঙ্গ লাভ করে, যে সুন্দরীকে কোন পুরুষ স্পর্শও করতে পারেনি, তার ঘন কুঞ্চিত কেশদাম থেকে পায়ের রক্তিম নখর পর্য্যন্ত যৌবনের প্রতি স্তরে স্তরে চলছে তার গৌরব-লীলা। অপরাহ্ণে তাই, তার বিজয়ের গর্ব্ব হাসি!

প্রবীর এই সূর্য্যাস্ত দেখছিল আর মনে মনে জটিল জাল বুনছিল, বুনে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে পথ হারিয়ে প্রতি পদে পদে তাতে নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে। এটাই তার শ্রেষ্ঠ আনন্দ। সম্মুখে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন ও ছবির বৈচিত্র, বিমিশ্র বর্ণের সমন্বয়। স্থৈর্য্যকে সে ঘৃণা করে, ভালবাসে পরিবর্ত্তনকে! পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনকে সে প্রতি মুহূর্ত্তে চায়।

সূর্য্য অস্তকে সম্মুখে রেখে প্রবীর নিজের জীবনের ইতিহাসকে দেখছিল। দীপ্ত সূর্য্যের মতোই সে সুখী, সে দীপ্ত, সে সুখী, সে রক্তিম! প্রবীর ভাবে সে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখী, আশৈশব ধনীর দোলায় প্রতিপালিত হয়ে সে আজ পৃথিবীতে একা ও শ্রেষ্ঠ সুখী।

তার বাবা ছিলেন বিহারে এক সহরে একজন অন্যতম উকীল। কবে কোন বহু দিন পূর্ব্বে অর্থের লোভে তিনি আসেন বিহারে, অর্থ ছিল অপর্য্যাপ্ত এ প্রদেশে, অধিবাসী ছিল মূর্খ। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল! শেষ বয়সে হিসাব করে দেখা গেল তিনি তার আশাতীত পেয়েছেন, আশাতীত হারিয়েছেন। সহরের বুকের ওপর করে গেছেন

একখানা হাল ফ্যাশানের বাড়ী পশ্চাতে করে গেছেন বিহারের উর্ব্বর ভূমিতে একটী ছোটখাট গোছান জমিদারী, ব্যাঙ্কের খাতায় বেশ মোটা অঙ্কের সংখ্যা। প্রবীর তার একমাত্র সন্তান। প্রবীরের বয়স যখন চার বছর তখন তার মা মারা যায়। সে আজ বহুদিনের কথা। প্রবীরের বাবা ওকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেন, প্রবীর পেল পর্য্যাপ্ত আদর, নিজের মনমতো শিক্ষা, দীক্ষা। ধনী নন্দন প্রবীর সম্পূর্ণ আধুনিক অভিজাত যুবক। প্রবীরের বাবা মারা গেলেন, প্রবীর হ'লো জগতে একা, অধীশ্বর।

ওর জীবনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় ও একটা পৃথিবীর গড্ডালিকা প্রবাহের অন্যান্য সভ্যের চেয়ে বেশ স্বাতন্ত্র! ওর অভিরুচি, ওর জীবন যাত্রার প্রণালী, ওর দৈনন্দিন কার্য্য তালিকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন শৈশবে দশজনের মতোই লেখাপড়া শিখল, যথা সময়ে মেট্রিকুলেশন পাশ ও করলো। তার পরই এলো ওর বৈচিত্র, স্বাতন্ত্র। নিজেকে চিনলো, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝলো সে এ জগতে দশজনের একজন হতে আসেনি, তার পথ অন্য, আবহমান কাল থেকে প্রবাহিত চিরন্তনী স্রোতে সে হাত পেতে ভিক্ষা নিতে পারবে না, সে চলবে স্রোতের বিপরীত দিকে, চলার পথে হবে যুদ্ধ ঢেউয়ের সঙ্গে, প্রবাহিত জল হবে বিশুদ্ধ, তীরে সে তরঙ্গ আঘাত করে তাকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তুলবে, তার স্থির পঙ্কিল ভাবকে করবে চঞ্চল! ও বুঝলো প্রবীর শিল্পী হবে! পৃথিবীর প্রতি রেখাটীকে ও মূর্ত্তিমতী করে তুলবে। শৈশব থেকেই এদিকে ওর বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। সে সময়কার দু একখানা ছবি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি উপার্জ্জনও করেছিল। প্রবীর প্রবেশ পেল আর্ট স্কুলে, তার বাবা তাতে বাধা দেননি, দিলে ও প্রবীর তাকে সম্মান করতো না।

আশৈশব বিদ্রোহী সে, নিজের পথে অন্য কাউকে অন্তরায় দেখলে সে তাকে সম্মান বা ক্ষমা করতো না।

এই সময়ে তার বাবা মারা গেলেন! স্কুলের সম্পূর্ণ গতি না দেখেই ও চলে আসে তার বাবার কর্ম্ম ক্ষেত্রে, অধীশ্বর হ'লো পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের। ইতিমধ্যে সে যথেষ্ট খ্যাতি উপার্জ্জন করেছে একজন নবীন শিল্পী বলে'! তার শিল্প এনে দিয়েছে শিল্প জগতে এক নতুন অধ্যায়।

প্রবীরের সামাজিক জীবনের পর্য্যালোচনা করতে গেলে সে হয়ে দাঁড়াবে এক মহাভারতীয় ব্যাপার! খুব সংক্ষেপে প্রবীর ছিল বিদ্রোহী ও প্রেমিক! বিহারের ক্ষুদ্র সহরে মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীর মধ্যে সে হয়ে দাড়িয়েছিল দৃষ্টি কটু। পিতার বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁর পদমর্য্যাদার খাতিরে প্রবীরকে সামনা সামনি কেউ কিছু বলতে পারিনি, শ্রেষ্ঠ সুযোগ পেলো তার মৃত্যুর পর। প্রবীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবিধ ভবিষ্যৎ বাণী হয়ে গেল। প্রবীরের এটা খুব ভাল লাগত, সে পেতো এই রকম জীবনে শ্রেষ্ঠ আনন্দ। দারিদ্র এর কঠোর কশাঘাত না পড়লে জগতকে তুচ্ছ করা যায়।

আজ সূর্য্যাস্তের সময় সে ইজি চেয়ারে বসে বসে তার জীবনকে নিয়ে আলোচনা করছিল আর সুখী হচ্ছিল। সে সুখী-সে সুখী-সে সুখী! লেখার ভালবাসা তাকে জগতে শ্রেষ্ঠ সুখী করেছে। বিধাতার কী অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই লেখা। তার যৌবনের প্রতি রেখাটী অবর্ণনীয়। বাল্যকালের খেলার সাথী আজ হয়েছে প্রিয়া, প্রবীরেরই চোখের সম্মুখে বালিকা হ'লো কিশোরী, যৌবন এলো কিশোরীর অঙ্গের প্রতি স্তরে স্তরে, সে হ'লো অপূর্ব্ব সে হ'লো মিষ্টি। দুই বালক বালিকা হ'লো প্রেমিক প্রেমিকা, তাদের অজ্ঞাতে তারা দুজনে জড়িয়ে পড়েছে, একদিন হঠাৎ অবিষ্কার করলো তাদের ছাড়াছাড়ি অসম্ভব, পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ

ভাবে দান করে জিতে গেল! লেখার ছবি অসংখ্য প্রকারের এঁকেছে। লেখাও দিয়েছে সিটিং তার Studioতে বিভিন্ন ও অসংখ্য প্রকারে অঙ্গ ভঙ্গী করে, একত্র করলে হয়তো দেখা যায় লেখার দেহের কোন রেখা আর অবশিষ্ট নেই যেটা ফুটে ওঠেনি প্রবীরের তুলির স্পর্শে। তাদের ভালবাসার পরিশ্রম ছিল না বিরাম ছিল না। লেখা প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবতো বুঝি বা তার ভালবাসা ভাটিয়ে আসছে, নারী বোধহয় এর চেয়েও ভালবাসতে পারে পুরুষকে। লেখা তাই বিভিন্ন উপায়ে প্রবীরকে ভালবাসতো, আজ একভাবে, কাল একভাবে, প্রত্যেক ভাবকে সে ভাবতো প্রবীরকে বেশী ভালবাসবার উচ্চতর উপায়! প্রবীর একা, তার ঘর, বিছানা, ড্রয়িং রুম, ষ্টুডিও কোন দিনই প্রবীর নিজে গুছিয়ে রাখতে পারলো না তার সময় নেই! লেখা এসে সেগুলো গুছিয়ে দ্যায়, প্রবীরকে মানুষ হ'তে উপদেশ দেয়।

গুছিয়ে রাখলে তোমার হাতের ছোঁওয়া সব জিনিষে লাগবে কী করে—আমি ইচ্ছে করেই রাখিনা।

"কী যে বুদ্ধি। আমি কী চিরদিন থাকবো। তখন কী করবে?"

চিরদিন থাকবে না? কোথায় যাবে আবার?

কেন আমার কী বিয়ে হবে না? লেখা হেসে বলে কথাটা, হাসির শেষ টানটুকু বিকৃত হয়ে গিয়ে তার মুখ করে দ্যায় বিকৃত, ওটা কিসের ভাষা তা' তার অন্তর জানে।

আচ্ছা মাঝে মাঝে ত' আসবে না কী একেবারে জন্মের মতো যাবে—তখন এসে গুছিয়ে দিও—

"আমার দায় পড়েছে—" লেখা এ উত্তর আশা করিনি! তাদের বিয়ে হতে পারে না এটা চিরদিন তাদেরকে ব্যথা দিয়েছে (যতদিন তারা এটা বুঝতে পেরেছে)।

প্রবীরের কোন অভিভাবক নেই! লেখার অভিভাবক আছে

সম্পূর্ণ ও অসংখ্য! প্রবীর সম্পূর্ণ আধুনিক বরং অতি আধুনিক বল্লে অত্যুক্তি হয় না! তার জীবনের কার্য্য তালিকা, তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পদ্ধতি বিচিত্র ও বিভিন্ন! সে যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখেছে, নারীকে দেখছে, তাকে পেতে চায়, দশে তা পারে না তাই ওর কার্য্য কলাপ তাদের দৃষ্টি কটু, লেখাও পারে না প্রবীরের পদ্ধতি নিতে, পারেনা বলতে তার অক্ষমতা বোঝায়, অনিচ্ছা নয়।

লেখা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী মেয়ে। মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙ্গালী মেয়েরা যা হয় লেখা সম্পূর্ণ ভাবে তাই। শৈশবে সে স্কুলেও গিয়েছে, সেখানে সবই কিছু কিছু শিখেছে, তার সঙ্গে শিখেছে পৃথিবীতে নারীর কার্য্য পদ্ধতি। এমন একটা দিন এলো যখন আর নাকি স্কুল যাওয়াটা অশোভন দেখাতো (তার মা তাই বুঝলেন) অর্থাৎ লেখার ফ্রক ছেড়ে কাপড় পরবার মতো দেহের পরিবর্ত্তন ঘটলেই তার স্কুল যাওয়া বন্ধ হলো। বাড়ীতে কিছু কিছু পড়তো! ছুঁচ ও কাটার বিভিন্ন কাজ শিখলো, ব্লাউজের আধুনিকতম 'কাট' শিখলো, তার হাতে কাজটা কেমন হ'লে মানায়, বুকের কাটাটা কতোদূর পর্য্যন্ত নামতে পারে, হাতটা কতোদূর পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারে, টেপ্‌ দেওয়া সেমিজের ওপর কতোদূর পাতলা ব্লাউজ সাধারণতঃ পরা যেতে পারে, কোন রংটা বেছে নিলে দেহটা বেশী আকর্ষণী হয়! দেহ চর্চ্চা হিসাবে তার সূক্ষম ও তীব্র দৃষ্টি হ'লো ঘন কেশাগ্র থেকে, বঙ্কিম ভ্রূ থেকে পায়ের রক্তিম নখর পর্য্যন্ত, দেহের প্রতি রেখাটী পর্য্যন্ত! দেহের ও যৌবনের পরিচর্য্যা হিসাবে, বেশভূষনের সূক্ষ্ম দৃষ্টি বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অতি আধুনিক, প্রবীর তাকে এ বিষয়ে চিরদিন সাহায্য করে এসেছে অতি আধুনিক জগতের খবর দিয়ে, মত দিতে, direction দিয়ে! খুব বেশী লেখাপড়া শেখান প্রবীর ভালবাসতো না অন্ততঃ পক্ষে সে এই ভাবতো যে মেয়ের পুরুষ অপেক্ষা কিছু কম শিক্ষা লাভ করুক তা না হলে পুরুষ সম্পূর্ণ ভাবে মেয়েকে

পেতে পারে না! পুরুষকে নারীর সর্ব্বস্ব সম্পূর্ণ দেওয়ার অন্তরায় হয়ে দাড়ায় নাকি তার এই উচ্চ শিক্ষার সচেতন অহমিকা! এই ভাবটা তার ব্যক্তিগত ভাবে অনেকটা স্বার্থগত দেখায়, জগতের হিতাহিত এর দিকে প্রবীর ভ্রূক্ষেপ করে না! সে শ্রেষ্ঠ স্বার্থপর! লেখাকে তাই সে খুবই স্বল্প লেখাপড়া শিখিয়েছে যেটুকু না হ'লে জগতটা থেকে যায় অন্ধকার, যেটুকু জানলে নারী তার কর্ত্তব্য জানতে পারে প্রবীর সেটুকুই তাকে শিখতে বলেছে। লেখার মা প্রবীরকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন! প্রবীর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে সেই যৌবনের প্রারম্ভ থেকে শিখিয়েছে লেখাকে যে নারীর শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি ও কর্ত্তব্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান করা পুরুষের কাছে।

লেখা শিখলো কম, জানলো অনেক বেশী, জগতের প্রতি রোমকূপ সে পুঙ্খানু পুঙ্খ রূপে পড়লো। প্রবীর যা চেয়েছিল তা সে হ'তে পারলো না। বাংলা নভেল পড়ে, সচেতন দেহ চর্চ্চা করে, কম শিখে, বেশী জেনে লেখা হ'লো সম্পূর্ণ গ্রাম্য ও সহরের মাঝামাঝি একজন মেয়ে। চরিত্র হীনের "সাবিত্রী" হ'লো তার আদর্শ নারী।

তবে প্রবীরকে ছাড়া জগতে অন্য পুরুষ জানতো না। তাকে সে আপ্রাণ ভালবাসে, ভালবাসে তার প্রতি মুহূর্ত্তটীকে, প্রতি অঙ্গটীকে। এ ভালবাসা নারীর ভালবাসা পুরুষের জন্য, তার দেহ চর্চ্চা শুধু প্রবীরেরই জন্য, তার আকর্ষণ শুধু প্রবীরেরই জন্য। লেখা বিভিন্ন উপায়ে তাদের ভালবাসা সজাগ ও রক্তিম রাখতে চায়, প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় করে বুঝি বা সে রাগ রক্তিমতা স্তিমিত হয়ে আসছে। কোন নতুন প্রকারের বেশ ভূষণ করে সে আসে প্রবীরের অভিমত জিজ্ঞাসা করতে তার ভালবাসাকে নতুন করতে, নিজের দেহ আরো আকর্ষণী করতে। এই ভালবাসা সজাগ রাখবার জন্য সে কোন কোনদিন প্রবীরের বাসায় একবারও যেতো

না (তাদের একেবারে পাসাপাসি বাসা)—প্রবীর বার বার ছুটে আসতো তার বাড়ীতে—

"কী এতোক্ষণ যাওনি যে—কী শাস্তি জানো ত'? চলো শিগ্‌গির এখুনি তোমার হাতে চা খাবো।

"এই দুপুরে!—উহু-হু, লাগে লাগে, ছাড়ো ছাড়ো—লক্ষীটী আর করবো না—আসছি কাছে—গেল যে আমার কাপড় খুলে, অসভ্য! এই যে—" লেখার চোখ বুজে আসে আনন্দে, উপভোগে। লেখা শ্রেষ্ঠ সুখী।

—"চলো তোমার বাসায়"—

আগষ্ট মাসে লেখার বিয়ে ঠিক হয়েছে কোথায় বাংলার এক সহরে। লেখা বলেচে যে তার বিয়ের পর সে প্রবীরকে এতো বেশী ভালবাসবে যে জগতে এ যুগ পর্য্যন্ত তত কেউ কাউকে ভাল বাসেনি। প্রবীর একটুও দুঃখিত নয় এতে বরং সুখী! তাদের কী যেন পরামর্শ হয়েছে, লেখার বিয়ের পর কী করে তাদের সম্পর্ক আরো নিবিড় হবে তার বিশেষ পরামর্শ হয়ে গেছে। লেখা প্রতিজ্ঞা করেছে প্রবীরের কাছে যে সে তার স্বামীর কাছ থেকে সন্তান ভিক্ষা নেবে না। সন্তান হ'লে স্বামীর ওপর ব্যথা হয়ে যায় অসম্ভব রকম, স্বামীর রক্ত নারীর শিরায় প্রশিরায় প্রবাহিত হয়ে তাকে পরাস্ত করে, সন্তানের মধ্যে দেখে নারী স্বামীর ও নিজের মিলিত প্রতিমূর্ত্তি। সে হয়ে দাড়ায় তাদের দুজনরে মধ্যে মিলন সেতু, তার জন্মের পরে আমুল পরিবর্ত্তন হয়ে যায় নারীর অন্তরের, প্রিয়া হয় মাতা, মাতার অন্তর, তার দেহের প্রতি রক্ত বিন্দু পৃথক প্রিয়ার রক্তবিন্দু থেকে, অন্তর তার নতুন করে জন্মলাভ করে, যে সুধা ছিল না প্রিয়ার বুকে সে সুধা ভরে ওঠে তার বুকের অনুতে পরমানুতে। সন্তান বন্ধনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রবীর এটা প্রগাঢ় বিশ্বাস করতো, লেথাকে

বিশ্বাস করিয়েছিল, লেখা আন্তরিক প্রতিজ্ঞা করেছিল এ বিষয়ে এই ভয়ে যে হয়তো সে প্রবীরকে ভালবাসতে পারবে না।

পুরুষ নারীকে চিরদিন অবিশ্বাস করে এসেছে। হঠাৎ কাল রাতে প্রবীরের মাথা গোলমাল হয়ে গেল, সে লেখাকে নয় নারীকে অবিশ্বাস করলো। নারী লেখা একজন পুরুষের সঙ্গলাভ করবে অথচ তার কাছ থেকে সন্তান নেবে না এটা স্বয়ং মহেশও বিশ্বাস করতে পারবে না, ওটা লেখার সাময়িক উত্তেজনার প্রেমোচ্ছাস মাত্র। লেখার অমতে ওর মন বদলে যাবে, ওর নারীত্ব, ওর মাতৃত্ব ওর প্রেমকে দেবে গলাটিপে মেরে। নারী প্রিয়া হয় শুধু মাতা হবার জন্য। মাতৃত্ব তার শ্রেষ্ঠ মজ্জাগত কামনা। প্রবীর লেখাকে একখানা বৃহৎ চিঠি লিখলো। চিঠিখানা আজ সকালে তাকে দিয়েছে—এখন উত্তর পাবে। তারই আশায় বসে। দোলায় দুলছে তার মন।

লেখা এলো। তখন বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। প্রবীরের সামনে সূর্য্য ডুবে গেছে কিছুক্ষণ হ'লো। চাকর আলো দিতে চেলে সে বারণ করে।

"একী প্রবীরদা। অন্ধকারে বসে যে। চাকরগুলো সব যেন এক একজন নবাব এই দুখিয়া—"

"এই যে লেখা—না না আলো থাক্। আমিই বারণ করেছি। তুমি বসো এই চেয়ারটায়"—সামনের একখানা চেয়ার দেখিয়ে দেয়।

বয় চা দে যাও—

লেখা চা ঢেলে প্রবীরকে দ্যায় নিজে নেয়। অবান্তর গল্পের স্রোত চলে। লেখা একটা নতুন ব্লাউজ পড়েছে তার ফ্যাসানটা প্রবীরকে দেখায়, তার অভিমত চায়! প্রবীর প্রশংসা করে। তাদের গল্পের কোন সূত্র নেই যে সূত্র তাদের অবান্তর এলোমেলো গল্পের টুকরো গুলোকে

বাধতে পারে। যাবার সময় লেখা একখানা চিঠি প্রবীরের হাতে দিয়ে যায়—"তোমার সকালের চিঠির উত্তর প্রবীরদা"।

প্রবীর চিঠিখানা হাতে করে ঠিক সেই ভাবেই অন্ধকারে বসে রইল, সম্মুখের অন্ধকারকে সে অবিশ্বাস করছে, ভাবছে ওরই এক চাপ কালো অন্ধকার হয়তো তার জীবনের ওপর ঘনিয়ে আসছে তার সমস্ত কামনাকে কালো করে দিতে। এই চিঠিখানা তার এতোদিনের খেলাকে প্রাণ দেবে, যে খেলা এতোদিন ছিল প্রেমের ক্ষণিকোচ্ছাস সেটাকে প্রবীর করতে চায় স্থির, সত্য, অটুট। এই চিঠি হয় তার প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে নয় বিসর্জ্জন দেবে। যে প্রতিমাকে সে নিজে হাতে গড়ে তুলেছে তার আজ শেষ পরিচয়। পতি প্রবীর। তার প্রাণপ্রিয়া ছবিও শিল্পী প্রবীর, রেখায় রেখায় ফুটিয়ে তুলবে প্রাণ নতুবা বিশ্রী এক কালির কালোর আবরণে তাকে ঢেকে দেবে। প্রবীর চিঠি পড়তে সাহস করছে না, সে চায় না তার প্রাণের মত্ততাকে এতো শিগ্‌গিরই থামিয়ে দিতে। কী লিখেছে লেখা! লেখা যে তাকে এতো ভালবাসে। যথা-সর্ব্বস্ব দান করতেও সে কুণ্ঠিতা হয়নি কোনদিন—তবুও এটা যে নারীর শ্রেষ্ঠ সজ্জা। লেখা আর যাই হোক নারী। প্রবীর আর ভাবতে পারছে না। কেন সে এ অদ্ভুত আব্দার করলো, হয়তো এই আব্দারের জন্য সে লেখাকে হারাবে—অবিশ্বাস। অবিশ্বাস মানুষকে অধঃপতনের দিকে টেনে নামিয়েছে তাকে পথের কাঙ্গাল করেছে। অন্ধকারে সে চিঠিখানা দেখছে—অন্ধকার খামখানার চতুঃপার্শ্বে ঘিরে আছে; ভেতরেও বোধহয় এই রকম একচাপ অন্ধকার, কলমের গোড়া দিয়ে কেটে কেটে ভাগ করে তাকে রূপ দিয়েছে। প্রবীর চিঠিখানাকে বরাবর হাত বুলিয়ে দেখছে। বন্ধকরা খাম—ওপরের শিরো নামটা পর্য্যন্ত দেখতে তার সাহস হচ্ছে না। চিঠিখানা সে খুলবে না—যুগ যুগ ধরে এই রকম বন্ধ চিঠি নিয়ে বসে থাকবে, লেখাকে হারাতে পারবে না। ভয় কেন। তার কামনা পূর্ণও

তো হ'তে পারে, হতাশের আশাটা সে কেন করছে। চিঠিখানা হয়তো আজ তাকে জীবনের সবচেয়ে সুমধুর রাত্রি এনে দেবে, হয়তো—হয়তো—কিন্তু এই বিশ্রী অন্ধকারটাকে সে অবিশ্বাস করছে—আজ পূর্ণিমা হ'লো না কেন? অন্ধকার বিভীষিকা।

"ছটু, বাতি দেও"—বিশ্রী অন্ধকার দূর হ'ক্।

লেখা লিখেছে

শ্রীচরণেষু,

প্রবীরদা,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে আজ যেন হঠাৎ নিজেকে চিনে ফেললাম। প্রথমেই বোঝা যাচ্ছে তুমি আমাকে অবিশ্বাস করেছ, এবং তোমার লেখার প্রতিছত্রে যে সুর বেজে উঠেছে সে সুর অবিশ্বাস করছে পৃথিবীর সমস্ত নারীকে, সত্যি প্রবীরদা যুগ যুগ ধরে পুরুষ নারীকে শুধু অবিশ্বাসই করে এসেছে কিন্তু সে অবিশ্বাসের পরিবর্ত্তে নারী পুরুষকে দিয়েছে তার যথাসর্ব্বস্ব, তার অন্তর, তার হৃদয়, তার দেহের প্রতি অনু পরমাণু পর্যান্ত, কিন্তু তবুও এতোদিনে পুরুষের আন্তরিক অবিশ্বাস ঘোচেনি। হঠাৎ তোমার মনের এ পরিবর্ত্তনের কারণ কী? সাময়িক উত্তেজনার অসাময়িক ফল নয়ত? ছোট বেলা থেকে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানিনি। শৈশবে তোমাকে পেয়েছি খেলার সাথী, তারপর এসেছে যৌবন, যে বয়সে নারী একজন পুরুষ ভালবাসবেই, যে বয়সে তার অন্তর ভরে উঠ্‌লে অন্য কাউকে তার অংশ দিয়ে বইবার ক্ষমতা পায় সে সময় সামনে দেখলাম তুমি--তোমাকে আমার সব দিয়েছি। আমার দেহের প্রতি রোমকূপে রোমকূপে তোমার প্রতিমূর্ত্তি-আমার অন্তর, আমার হৃদয় এবং মনে মনে আমার দেহও তোমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে দান করেছি। তোমার কাছে জীবনে কোনদিন কোন বিষয়ে সঙ্কোচ করিনি পর-পুরুষ তোমাকে এক মুহূর্ত্তও ভাবিনি।

তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। সমাজে বাধে। তুমি সমাজ মনোনা, আমি মানি, আমার মাথার যারা অভিভাবক তারা ভীষণ ভাবে মানেন। তোমার কোন অভিভাবক নেই, তুমি পুরুষ, আমার অভিভাবক আছে আমি নারী। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে বহু দিন আগে হয়ে গেছে, শৈশবের সেই কোন মুহূর্তে তোমার ও আমার অন্তর মিশে এক হয়ে গেছে এটাই যতার্থ বিয়ে এই বিয়েকেই আমি বরণ করেছি তা না হ'লে বাংলা দেশে যাবার আগে হয় আত্মহত্যা করতাম নয় তোমাকে নিয়ে এমন এক জায়গায় চলে যেতাম, দূরে অনেক দূরে যেখানে আমাদের কেউ চেনে না, তুমি স্বামী আমি প্রিয়া। প্রবীরদা আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাইরে ঢাক ঢোল বাজিয়ে, সানাইয়ের করুণ সুর তুলে শুধু সমাজকে ভোলান হয় তাদেরকে ঠকিয়ে তাদের চোখে ধূলো দেওয়া হয়। তুমি কী মনে করেছ বাংলা দেশের সেই নবাগত ভদ্রলোকটিকে কোন দিন আমি ভালবাসতে পারবো ? তার কাছ থেকে কোন বন্ধন কোন দিন নেবো।

তুমি জানিয়েছ তোমার রক্ত ও আমার রক্ত দিয়ে এক প্রতিমূর্ত্তি এঁকে আমাদের মিলনের প্রতিষ্ঠা করতে চাও। প্রতিষ্ঠা সমন্ধে দ্বিধা আছে কী? তুমি আমাকে একটী সন্তান দিতে চাও। আমারও গ্রহণ করতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই কিন্তু তার ভবিষ্যৎ ভেবে দেখেছ ? তোমার দেওয়া সন্তান বড় হবে কিন্তু সে বাংলা দেশের সেই ভদ্রলোককেই বাবা বলে ডাকবে আর আমাকে বলবে মা এতো বড় মিথ্যার প্রশয় তুমি দেবে ? আমাদের মিলন জগতকে লুকিয়ে হবে ? আমি এতো বড়ো ভীরু হবো যে কানে কানে তার কোনদিন শিখিয়ে দিতে পারবো না যে তুমি ওর পিতা। এইটা কী আমার পক্ষে কম আপশোষ। সে সন্তান ভবিষ্যতে তোমার পরিবর্ত্তে অন্য আর একজনকে সাহায্য করবে। তোমার দান তো আমি পেলাম না সে পেলে অন্য আর একজন। তোমার দানের ভোক্তা হবার

ক্ষমতা এ পৃথিবীতে তুমি ও আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কার আর আছে ? সে হয়না প্রবীরদা।

আমাকে বিশ্বাস করো ? সে ব্যক্তি আমার দেহ কোনদিন স্পর্শও করতে পারবে না। আমাকে সন্তান ভিক্ষা দেবার স্পর্দ্ধাও সে রাখে না। তোমার লেখা এ পৃথিবীতে অন্য কারুর দান নেবে হাত পেতে ? তার আগে লেখার মৃত্যু হোক।

আমার এ বিয়ে হোক তুমি বাধা দিও না। এর পরে তোমাকে আরো নিবিড় করে ভালবাসবো, প্রতি মূহূর্ত্তে তোমাকে কাছে পাবো, প্রতি মূহূর্ত্তে আমার প্রতি পরমানু তোমাকে দান করবো দূর থেকে পূজো সার্থক হয়, ধ্যান করা যায় আত্মস্থ হয়ে! দেবতা যদি বহুদূর না থাকতেন, তিনি যদি সদাসর্ব্বদা দেখা দিতেন, ভক্ত এতো গভীর ভাবে তার ধ্যান করতে পারতো না, তাকে এতো ভালবাসতে পারতো না। দেখা পেলেই নাকি মুক্তি, তাঁতে বিলীন হয়ে নিজের অস্তিত্ব হারাতে হয়। আমি তা চাই না। তোমাকে আমি যুগ যুগ পূজো করতে চাই, প্রতি যুগে প্রতি মূহূর্ত্তে তোমাকে ভালবাসবো, তোমাকে চাই, তোমাকে দান করবো।

আমি আজ আসি। কাল সকালে যাবো! আমার প্রাণভরা ভালবাসা নিও। চিঠিতে চুমু দেওয়া তুমি পছন্দ করো না ওটা কাল সকালের জন্য রইল। প্রণাম নিও।

ইতি
তোমারই
লেখা।

একবার, দুবার, বারবার প্রবীর চিঠিখানা পড়লো। তার পর আংশিক ভাবে একবার এ অংশ একবার সে অংশ পড়লো। বিভিন্ন প্রকারে বহুবার পড়লো। যতোবার পড়ে ততোবার সে লেখার চিঠিকে

অবিশ্বাস করে, তার মনে হ'লো লেখার চিঠিতে যে সুর সে সুর প্রবীর তাকে দেয়নি, লেখা অন্য সুর শিখেছে নিজে নিজে। প্রবীর ভেবে রেখেছিল ঠিক যে বিন্দু পর্য্যন্ত প্রবীর তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছে লেখা তার এক বিন্দুও বেশী দূরে যায়নি। সে আজ বুঝলো লেখা তাব অজ্ঞাতে অনেক দূর গিয়েছে, অনেক বেশী পৃথিবীকে চিনেছে। তার চিঠির সুরে আজ অবিশ্বাসের গন্ধ। প্রবীরকে বিদ্রোহী করলো তার চিঠি। প্রিয়ার কাছ থেকে প্রেমের অনুষ্ঠানে বাধা পড়লে পুরুষের পৌরষ ওঠে জেগে, সে চায় তারই সম্পূর্ণ জয়। লেখা এতোদিন সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দিয়েছে প্রবীরের কাছে, সে সুযোগ তাকে দিয়েছে আধিপত্য বাধা পেয়ে আজ প্রবীর বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লো। লেখা আজ কতক ছায়া-কথা দিয়ে তার অনুরোধ রাখলোনা, বিয়ের পর সে সন্তান ভিক্ষা নেবে না এমন নিশ্চয়তা কে দিতে পারে। নারী নিজে? অসম্ভব। জগতে ক্ষুদ্রতম কীট থেকে স্বর্গের দেবী পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে মাতা হবার জন্য লালায়িত, যার জন্য সে জগতের সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে পারে, তার মুখে এ প্রতিজ্ঞা পরিহাস মাত্র। প্রবীর অবিশ্বাস করবে, জগৎ অবিশ্বাস করবে। প্রবীর মনে মনে স্থির করলো সে ঠিক পথ ধরেছে, লেখার কাছে সে তার অনুরোধ দাবী করবে। লেখার চিঠি পড়ার পর প্রবীর প্রতি মুহূর্ত্তকে অবিশ্বাস করছে, এখনই সে লেখাকে ডেকে তার দাবী চাইবে, সকালে সে মরে যেতে পারে, পৃথিবীটা একটা বিরাট প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে চুড় হয়ে যেতে পারে, তার মত বদলে যেতে পারে, লেখা মরে যেতে পারে, তার পিসতুতো ভায়ের সঙ্গে গভীর রাতে পালিয়ে যেতে পারে বহুদূর দেশে, কাল সকাল পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করতে বিশ্বাস করছে না, আজ রাতেই তার হতাশ, লেখার অস্বীকার প্রবীরের অন্তরের পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, হতাশ হয়ে পুরুষ সাধু হ'য়ে ওঠে, সে সাধুতা হতাশের প্রতিক্রিয়া মাত্র।

শুয়ে শুয়ে প্রবীর অজস্র যুক্তি তার পক্ষ থেকে অন্ধকার ঘরে শোনাতে লাগলো তার মনে হ'লো তার যুক্তির উত্তরে প্রত্যেক বার লেখা যেন মাথা নেড়ে তার সামনে বলছে—"সে হয়না প্রবীরদা.'—অন্ধকারটা যেন বিশ্রী ভাবে তাকে পরিহাস করছে, পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোক তাকে পরিহাস করছে। লেখা নিশ্চয়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, প্রবীরকে ভালবাসবে তার বিয়ের পর আরো নিবিড় ভাবে, লেখা শিখেছে, ওটা তার বাইরের আবরণ, ভেতরের, তীব্র লালসা, কামনার রসিক দংশন ওর স্বামীর কাছ থেকে। বাঙ্গালী মেয়ে স্বামীকে কী চোখে যে দেখে। ভালবাসি, ভালবাসি, চিরদিন ভালবাসবো—। ও কথার কোন মূল্য নেই। নারী শুধু কথায় কোনদিন তৃপ্তি হয়নি, ওটা প্রতারণার শ্রেষ্ঠ প্রণালী। লেখা প্রতারণা করছে। লেখা. লেখা, লেখা—তার লেখা। প্রবীরের মাথা কেঁপে ওঠে. অত্যন্ত অধীর হয়ে সে শান্ত হয়ে পড়ে। তার অন্ধকার ঘরের প্রতি আসবাবটী পর্যান্ত তাকে পরিহাস করছে। মুখের ভালবাসা, সুদূর বাংলা দেশ থেকে চিঠিতে পাঠালো দুটো প্রেমের কথা. কালো কালি দিয়ে চিঠির কাগজের ওপর লেখা "চুমু", তার স্বামীর সবিস্তৃত বর্ণনা, বিয়ের পর জীবনের তার সুখদুঃখে কথা—প্রবীর চায়না। প্রবীর বাস্তব ছেড়ে তার রঙ্গীন মিথ্যা ওড়নাটাকে নোংড়া কীটের মতো ঘৃণা করে। ভালবাসা নিয়ে, নারী নিয়ে, কবিতা লেখা, কাব্য রচনা শ্রেষ্ঠ মূর্খের কাজ, ওটা রূঢ় বাস্তব, ওটাকে উপভোগ করা চলে, দূর থেকে দেখে কবিতা লেখা চলে না।

লেখা, লেখা, লেখা। এতো রাতে সে কী করছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে হয়তো, তার ঘরে একা, দরজা বন্ধ, আলোটা মিটমিট করে জ্বলছে, এক খানা হাত এলিয়ে পড়ে আছে, এক রাশ কালো চুল এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত, তার মুখখানা প্রবীর কিছুতেই স্পষ্ট মনে করতে পারলো না, তার প্রতি রেখাটী ধরা পড়ছে না, কি যেন হারিয়ে যাচ্ছে, লেখার ঘরের আলোটা

একটু বেশী করে দেবে, ওযাঃ নিবে গেছে বোধ হয়—তাদের বাড়ী-অন্ধকার সিঁড়ি,-চোর হাপাচ্ছে-রাস্তা, একটা কুকুর শুয়ে আছে,-কলকাতা,--সিনেমা হাউস্, গ্রটা, নর্ম্মা, মেওরেষ্ট, হালিউড, রুজ ভেল্ট, ফিলিপাইন, গান্ধী-ভারতবর্ষ-স্বাধীনতা-আফ্রিকার বাঁদর-কলার খোসা-প্রবীরের পা পিছলে সে পড়ে গেল।

প্রবীর ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন প্রবীরের যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন তার অভ্যাসগত সময়ের চেয়ে অনেক দেরী হয়েছে। প্রবীর জেগে বুঝলো সে অত্যান্ত পরিশ্রান্ত, তার দেহের সমস্ত পদার্থ যেন কে বের করে নিয়েছে। সে নিঃস্ব। তার মনে হচ্ছিল যেন আগের দিন সে মস্ত এক মকদ্দমায় হেরে তার যথা সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারী হয়েছে। সে নিঃস্ব, সে কাঙ্গাল। দারিদ্র মানুষকে বিদ্রোহী করে। মাথাটা সবচেয়ে বেশী ভারী মনে হচ্ছে। টিপ্ টিপ্ টিপ্। মাথার মধ্যে যেন ব্যাটারী চলছে। পিষ্টন দিয়ে কে যেন তার মাথার পদার্থগুলো ঘাড়ের কাছ থেকে ফুটো করে বের করে দিতে চাচ্ছে! ও শিরাটা বোধ হয় ছিড়ে বেরিয়ে যাবে।

লেখা এসে ঘরে ঢুকলো। সে আজ ভোরে স্নান করেছে, আকাশী রংএর একখানা সাড়ী ও ব্লাউজে ওর দেহের চতুর্দ্দিক ঘিরে আছে আকাশে গভীরতা, উত্তুঙ্গতা। পিটময় একরাশ কুচকুচে কালো চুল ছড়ান যেন একচাপ আষাঢ়ের কালো মেঘ। লেখা আজ পৃথিবী জয় করতে পারে। ওর সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা সুখস্পর্শ। দেহের প্রতি স্তর দিয়ে যেনঠাণ্ডা বাতাস বেরুচ্ছে, পরিস্কার শীতল স্বচ্ছ একচাপ জল, টলটলে। ওর দেহের যে কোন অংশে প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। লেখাকে দেখে প্রবীরের মাথাটা যেন শীতল হয়ে গেল, ব্যাটারির বিশ্রী শব্দ, পিষ্টনের অসহনীয় ধাক্কা মুহূর্ত্তে থেমে গেল।

কী এখনো শুয়ে রয়েছ। বাঃবা তুমি কুম্ভকর্ণের সাক্ষাৎ বাবা। চা খাওনি নিশ্চয়ই, যাক্, এক সঙ্গে খাই।

লেখা চায়ের হুকুম করে। প্রবীর একটাও কথা বলেনি, শুধু ওর মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে কী যেন খুঁজছে, হারাল বুঝি। লেখা প্রবীরের বুকের কাছে মুখো মুখি বসে। তার হাতখানা নিজের হাতে তু'লে নেয়, টিপে দ্যায়। প্রবীরেই চোখ বুজে আসে। তার হাতের স্পর্শ যেন ওর সমস্ত দেহ সুশীতল করছিল, প্রবীরের ইচ্ছা হচ্ছিল লেখার দেহে নিজের উত্তপ্ত দেহ চেপে ধরে।

"তোমার চোখ মুখ অমন দেখাচ্ছে যে কাল রাত জেগেছ বুঝি ?

সমস্ত রাত জাগিনি, তবে অনেক রাতে ঘুমিয়েছি

আবার সুরু করেছ, রাত জেগে ছবি অঁাকবে না আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে না।

না ছবি আঁকিনি।

তবে ?

একখানা ছবি কে চুরি করেছে সে খানা অঁাকবার চেষ্টা করছিলাম—একটা রেখাও তুলতে পারলাম না, বুঝলাম ওটা গেল !

কোন ছবিটা প্রবীরদা ? সেই অন্ধ ছেলেটা ?

না—তোমার ছবি ! অন্ধ ছেলেটা চোখ পেয়েছে !

এর জন্য এতো ! তা না হয় আর একখানা আমাকে দেখে তুলে নিও—কী ভঙ্গীতে তুলবে এবার।

তোমাকে অঁাকার মতো তুলি আমার আর নেই—লেখা।

লেখা এবার একটু ভয় পেলো ! প্রবীরকে এমন গম্ভীর ভাবে ত কখনো এতো ধোয়াটে কথা বলতে শোনেনি ! সে জোরে তার হাত খানা দু হাত দিয়ে নিজের বুকে সজোরে চেপে ধরে ! প্রবীরদা—প্রবীরদা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ প্রবীরদা—বলো ! আমায় তুমি বাঁচতে দেবে না মনস্থ করেছ।

প্রবীর বিদ্রোহী চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, লেখা ভয়ে তার বুকে মুখ ঢাকে। "প্রবীরদা তোমার কী হয়েছে—অমন করছ কেন? লেখার বুক ভয়ে সঙ্কুচিত হয়। সে বিশ্রী সন্দেহ করে।

কিছু হয়নি লেখা—তোমায় হারালাম—

আমায়? মৃত্যুর আগে ঈশ্বরেরও সাধ্য নেই তোমার কাছ থেকে আমায় কেড়ে নেয়। আমি শিল্পী নই প্ররীরদা আমি ভাস্কর! একখানা মূর্ত্তি খোদাই করে আমিও এঁকেছি। সেটাই প্রথম শেষ শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি! আর খোদাইএর স্থান নেই! কার মূর্ত্তি জানো—তোমার! মূর্ত্তি মোছে না প্রবীরদা।

ভেঙ্গে জলে ত' ভাসিয়ে দিতে পার।

"যে পাহাড়ের বুক কেটে মূর্ত্তি আঁকা সে পাহাড় নিজে চূড় না হওয়া পর্য্যন্ত মূর্ত্তি নষ্ট হতে পারে না।

"লেখা আমার ভিক্ষা পেলাম না—

ভিক্ষা না প্রবীরদা—তোমার দাবী, তোমার দান।

তবে পাবো—

ছিঃ প্রবীরদা তোমার কাছে প্রতারক হতে পারবো না—তোমার সন্তান অন্যকে বাবা বলবে এ আমি সইতে পারবো না। আমাদের মিলনের ফল অন্যকে দিয়ে আমাদের ভালবাসাকে তুচ্ছ করা হয়, এটা বোঝ না? আমাদের ভালবাসাটাকে তুমি এতো খেলো মনে করলে যে সেটাকে একটা সামান্য সন্তান দিয়ে সীল মোহর করতে চাও! তোমার ছেলেকে অন্য লোক অধিকার করবে? সে যখন আমাকে মা বলবে আর তাকে বাবা—তখন তুমি সামনে থাকবে না কিন্তু আমি থাক্‌বো।

কেন? সে বড় হ'লে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে আমিই তার যথার্থ. বাবা। লেখা প্রাণ খুলে হেসে ওঠে! "আজ কালকার ছেলে প্রবীরদা তোমাকে ঘৃণা করবে আমাকেও! ফল অন্য দাঁড়াবে। আমাকে

অবিশ্বাস করোনা প্রবীরদা—তার কাছে আমি সন্তান ভিক্ষা করতে পারবো না—বিশ্বাস করো। এ তোমার জিনিস! লেখা তার হাতখানা নিজে বুকের ওপর চেপে ধরে! আঃ—ঃ।

না লেখা, সন্তান আমি চাইই—তোমার সন্তান হবে আমার সন্তান।

ছিঃ প্রবীরদা—জগৎকে প্রতারণা করো কিন্তু আমাদের ভালবাসাকে জগতের চোখে মিথ্যা দাঁড় করিও না। আচ্ছা আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যদি আমার কখন ছেলে হয় সে তোমারই দান হবে। কিন্তু এ জীবনে নয়! জগতের চোখে প্রতারক করোনা আমাদের প্রেমকে।

লেখার সামনে প্রবীর তার দাবীকে তত জোরে রাখতে পারলো না। কাল রাতের বিদ্রোহী যুক্তি লেখার স্বর্গীয় রূপের সামনে মাথা তুলতে না পেরে নিষ্প্রভ হয়ে মরে গেল! প্রবীর শুধু লেখার দিকে চেয়ে রইল—যেন লেখাকে এই প্রথম দেখছে, এ যুবতিকে এতো সন্নিকটে এই প্রথম পেলো! সে মুগ্ধ হ'লো বিদ্রোহী হলোনা। নারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করা সামান্য পুরুষের সাধ্যাতীত। ওদের দেহের প্রতি রোমকূপে যাদু জানে, মুগ্ধ করে! তার কাছে দাবীর সুরে মোহ থাকলে সে দাবী ব্যর্থ হয়।

লেখা চলে যাবার পর প্ররীর নিজেকে ফিরে পেলো। ও বুঝলো যে সে মুগ্ধ হয়েছিল। লেখা তাকে ঠকালো, তাকে ত্যাগ করলো! তার ওই কবিত্ব, তাই ওই ধোয়াটে কথা প্রবীরকে সবচেয়ে অবিশ্বাস জন্মিয়েছে! ভালবাসা ভাটিয়ে আসলে সে থানে এসে পড়ে মুখের মিষ্টি বুলি—যে সত্যি ভালবাসে সে এতবার কেন বলবে—ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। নিজের জিনিসের মুখের ওপর ঝুকে পড়ে কে বারবার বলে তুমি আমার তুমি আমার। ওটা নিজেকে ঠকান, প্রতারণা করা। কোন জিনিস ফেলে দেওয়ার আগে তার ওপর মমতা একশ' গুন বেড়ে যায়।

প্রবীর লেখাকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করলো! । প্রতারক সে নারী।

প্রবীর কিছুতেই নিজেকে শান্ত করতে পারলো না, ওর মন ক্রমে ক্রমে লেখার প্রতি বিষাক্ত হয়ে গেল। যে গাছ নিজে হাতে রোপন করা হয়েছে তাতে সে ফলই আশা করেছিল, ফল না পেলে তার উচ্ছেদই হয়ে যাওয়া তার শেষ ইচ্ছা। তার মূল থেকে পাতাটি পর্যন্ত অকর্ম্মন্য অপদার্থ মনে হয়। প্রবীর স্থির করলো লেখাকে ভুলবে, ওর একটা রেখাও তার মনে থাকবে না। লেখার ছবি যতোগুলো ছিল সবগুলোকে একসঙ্গে নষ্ট করলো—তাতেও তৃপ্তি পেলো কিন্তু সেটা সাময়িক পর মুহূর্ত্ত থেকে একটা অসহনীয় বৃশ্চিক দংশন অনুভব করতে লাগলো। লেখা কী দোষ করেছে সত্যিই হয়তো ও প্রবীরকে আপ্রাণ ভালবাসে—সত্যিই হয়তো আপ্রাণ তাকে চায় অবিশ্বাসী ও নাও হতে পারে। প্রবীরের এমন কী অধিকার আছে যার জন্য সে লেখার মাতৃত্বের অধিপতি হতে পারে ও যা দিয়েছে সেটাই প্রবীরের পক্ষে আশাতীত। নারী স্বামী ছাড়া অন্য একজন পুরুষকে এর চেয়ে বেশী দান করা অসম্ভব। স্বামী! স্বামী! স্বামী! কী অধিকার তার। প্রবীর কেন তার স্বামীর চেয়ে কম হবে—কেন স্বামী হবে না। প্রবীর আবার বিদ্রোহী হয়। লেখাকে সে ভুলবে—লেখাকে সে হারাবে-হারাবে-হারাবে। প্রতিশোধ নেবে তার ব্যবহারের। প্রবীর তাকে ভুলবে—তার স্মৃতিলেশটুকু পর্য্যন্ত তার মনে রাখবে না। নিশ্চিহ্ন করবে লেখার রেখাকে।

আর লেখা সত্যিই সে দুঃখিনী! প্রবীরকে হারাতে তার ভয় হয় প্রতি মুহর্ত্তে ভয়—শেষ পর্য্যন্ত কেঁদে শান্ত হয় তার নির্জ্জন ঘরে, প্রার্থনা করে তার ভালবাসা অটুট রাখবার জন্য। প্রবীরের অনুরোধ সে রাখতে পারলো না বলে নির্জ্জনে বসে ভাবলেই সে কেঁদে ফেলে তার অন্তরে একটা বিরাট শূণ্যতা অনুভব করে। তার ভালবাসার কাছে প্রতারক হতে সে শিউরে ওঠে। লেখা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, অভিজাতের সৃষ্টি ছাড়া অভিসারের কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। প্রবীরের উদাসীনতা

দেখে সে শিউরে ওঠে, সে কেঁদে ফেলে, প্রবীরকে আরো বেশী ভালবেসে নিজের অভাব বোধটাকে পুরণ করতে চায়। তার দেহের প্রতি স্তরের প্রতি তার পড়ে গেল সূক্ষ্মতম দেহ চর্চ্চার তীব্র দৃষ্টি, ভোর থেকে রাত পর্য্যন্ত সে নিজেকে সর্ব্বদা করে রাখে লোভনীয়, প্রবীর যে যে রকম সাজ সজ্জা পছন্দ করে লেখা ক্রমান্বয়ে সে গুলো দিয়ে নিজেকে আকর্ষনীয় করে, প্রবীরকে সদাসর্ব্বদা পরিচর্য্যা করছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে চুমু খাচ্ছে, কোন একটা হাসির ব্যাপার নিয়ে তার বুকে মুখ গুজে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলছে—লেখার এ সমস্ত লীলা প্রবীরের চোখে আরো বিষ দৃশ্য লাগতো, ভাবতো অবিশ্বাসের মিথ্যা আবরণ এগুলো তাই রঙ্গীন। তাকে সে কাঁদতে চায়—তিন যুগ না কাঁদলে এ কাজের অনুতাপ হবে না। বুকে মুখ লুকিয়ে সে শোনে বিক্ষুব্ধ যুদ্ধের চাঞ্চল্য—শত শত মুমূর্ষের দীর্ঘশ্বাস লেখা চমকে ওঠে এ বাণী তো সে কখনো শোনেনি।

"প্রবীরদা—তুমি এমন হচ্ছ কেন"—কী যেন লেখা ভেবে নেয়। আচ্ছা প্রবীরদা তুমি পালাতে পারো—

কার সঙ্গে?—প্রবীর শ্লেষের হাসি হাসে! লেখা চমকে ওঠে।

এই আমার সঙ্গে—চলো আমরা অনেক দূরে পালিয়ে যাই—আর কাঁদিও না প্রবীরদা—চলো তুমি হবে আমার স্বামী—ভাই, রক্ষক, তোমাকে সব দুহাতে বিলিয়ে দেবো—প্র-বীরদা।

প্রবীর হিংস্র হয়ে ওঠে। তার মন দু ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়! কপালের লেখা ওঠে কুঞ্চিত হয়ে!

ছিঃ লেখা তুমি পরস্ত্রী—ভালবাসাকে প্রতারণা করতে পারি না। লেখা উদাস ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে, তার চোখে কোন ভাষা নেই। এই সেই প্রবীরদা।

প্রবীরদা--তুমি খুন করতে পারো? আমাকে বিষ খাইয়ে দাও না প্রবীরদা—আমি মরে বাচি!

তোমার এই দেহ, এই রূপ, এতো কামনা, এতো ভাবী সুখকে গলাটিপে মারবার আমার কোন্ অধিকার লেখা ? তোমার রয়েছে সংসার —তোমার রয়েছে বিশ্বলোক—" প্রবীর মুখ বিকৃত করে হাসে।

লেখা বাড়ী এসে কাঁদে—শুধু কাঁদে ! মৃত্যু-মৃত্যু দাও ঠাকুর"

বারান্দার ওপর যে আলোটা ছিল তারই একচাপ আলো এসে পড়েছে ঘরের একটা কোনে, সেটা খুবই ক্ষীণ যার প্রভাবে ঘরের গার অন্ধকার দূর করতে পারে না, তবে সাদা দেওয়ালে তার একটা শুভ্রতার প্রতিবিম্ব ঘরের একটু এমন ভাব বদলিয়েছে যেন ওটা চুনেরই ঔজ্জ্বল্যের আলো। অন্ধকারও আছে, আবার ঘরটাকে চেনাও যাচ্ছে। সূক্ষ্মতার অন্ধকার স্থূলের ক্ষীণ পরিচয়। লেখা খাটের ওপর শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে, তার প্রবীরদা তাকে ভুলবে, ভুলছে। এখনই কলকাতা যাবার কী এমন ভীষণ দরকার পড়লো। কাল ভোরের গাড়ীতে যাবে অথচ এখনো তাকে জানাইনি--আর আগে, প্রবীর কোথাও যাবার দুদিন আগে--লেখা বালিসে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলে। প্রবীরদা—প্রবীরদা—তার ইচ্ছা হয় চিৎকার করে প্রবীরকে ডেকে তার পায়ে মাথা ভেঙ্গে মরে। কেন সে এতো ভালবেসেছিল প্রবীরকে--ভালবাসার এ দৃশ্য দেখার আগে তার মৃত্যু হ'লো না কেন ? লেখা তাকে ভালবাসে জীবনে শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি পেয়েছে আর প্রতি মুহূর্ত্তে সে সুখ পেয়েছে, শৈশবের সেই অজ্ঞাত দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত সে যেন এক নেশা, ঘোরে কাটিয়েছে-তার মদের পেয়ালাকে নিঃশেষ করে' প্রবীরকে দিয়েছে--দিয়েছে আর স্বর্গীয় তৃপ্তি পেয়েছে। ভগবান নারীকে মাতা হবার শক্তি দিলে কেন---লেখা ভাবে তার ইচ্ছা হয় তার এই শক্তি নেই প্রবীরকে বুঝিয়ে দেয়। সে শুধু নারী—প্রবীরের চিরন্তনী প্রিয়া।

এক শ্রেণীর পুরুষ থাকে যারা শুধু পিতাই হতে চায় প্রিয়তম নয়, তাদেরকে ঘৃণা করা মুর্খতা। তাদেরকে ক্ষমা করো। প্রবীর এই শ্রেণীর

পুরুষ। তারা নারীকে চায় নিমিত্তরূপে কারণ তারা ছাড়া উপায় নেই।

লেখা শুয়ে শুয়ে শুধু কাঁদছে আর প্রবীরকে বেশী করে ভালবাসছে। প্রবীর গোপনে লেখার মাকে তার বিয়ের উপহার স্বরূপ হাজার টাকা দিয়ে গেছে আর বলে গেছে তাকে না জানাতে। প্রবীরদা এই কী তোমার উপহার তোমার লেখার জন্য। তোমার দান নিতে পারিনি বলে একী অপমান প্রবীরদা।

কে যেন তার ঘরে ঢুকলো। প্রবীর! লেখা উঠে বসে, তার মন চট্ করে খানিকটা পাতলা হয়ে ওঠে, আঁচল দিয়ে চোখ দুটোকে মুছে নেয়! সে উঠে গিয়ে প্রবীরের দুহাত ধরে এনে তার বিছানায় বসায় তার পাশে বসে দুহাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে, টেনে নেয় তার কোমল বুকে। প্রবীরের মন্দলাগেনা। তবুও তার হাত দুটো ধরে নামিয়ে দেয়। সে লেখাকে ভুলবে। লেখা অন্ধকারে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে তার চোখ যেন জ্বলছে।

প্রবীরদা কাল ভোরে নাকি তুমি কলকাত্তা যাচ্ছ ?

হ্যাঁ---

কই আমাকে তো কিছুই জানাওনি--তোমার জিনিস পত্র কে গুছিয়ে দিল। আমার ওপর রাগ করে শেষে কী বিদেশ বিভুঁয়ে কষ্ট পাবে নাকি! আমাকে জানাওনি কেন ?

তাই জানাতেই এলাম।

"এতক্ষনে! তোমার জিনিস পত্তর দেখে আসি চলো।

ও সব আমি দেখে নিয়েছি তোমার আর দরকার হবে না।

লেখা বুঝলো প্রবীরের জীবনে তার আবশ্যকতা আর বিন্দু মাত্র নেই! তারই এটা সূচী পত্র।

ঘরে আলো আনো লেখা--একা অন্ধকার ঘরে প্রবীরদাকে আর বিশ্বাস করো না--পশু সব পারে।

প্রবীর উঠে গিয়ে অদূরে একটা ইজিচেয়ারে বসে, ওঠার সময় লেখার আগ্রহ হাতকে অবজ্ঞা করলো। লেখার হাত অবশ হয়ে তার নিজের কোলের ওপর পড়ে যায়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। দুজনেই অন্ধকারের বুকে শান্তি খোঁজে। প্রবীর জানালা দিয়ে বাইরের বিরাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে, চতুর্দ্দিক যেন সে দেখতে পাচ্ছে শুধু দুটো চোখে, জল ভরে টস্‌টস্ করছে, অন্ধকারে জলের ফোটাগুলো যেন জ্বলছে। লেখা-লেখা-লেখার চোখ? না না লেখাকে সে ভুলেছে! ও চোখ তার নিজেরই চোখের প্রতিবিম্ব অন্ধকারে! জল কেন? তার চোখে জল। সে চোখ মোছে। লেখাকে ভুলবে! লেখাকে ভুলেছে। লেখা তাকিয়ে আছে প্রবীরের দিকে, তাকিয়ে আছে আর কাঁদছে, কাঁদছে আর ভালবাসছে!

তুমি কবে ফিরবে প্রবীরদা, শিগ্‌গিরই ফিরবে তো।

"না তুমি চলে যাবার পর!"

লেখার গলা শুকিয়ে তার কথা বন্ধ হয়ে আসে! তার দারুণ পিপাসা পেয়েছে! উঃ সমস্ত বুকখানা শুকনো, একবিন্দু রক্তও নেই! প্রবীর অন্ধকারে শুধু লেখার মুখই দেখতে পাচ্ছে, তাকে ভুলবে! লেখা আস্তে আস্তে ওঠে প্রবীরের পাশে গিয়ে হাটু পেতে বসে' তার কোলে মাথা গুজে কাঁদে--শুধু কাঁদে, প্রবীর বাধা দেয় না, সে শান্তি পায়।

লেখা--তুমি আমাকে ভুলে যেও--নিশ্চিহ্ন করে দিও প্রবীরের স্মৃতিটাকে, তোমার ভরা যৌবন অনর্থক কষ্ট পেয়ো না। ভুলতে পারবেত?

এ কথার উত্তর আমি দেবো না প্রবীরদা।

"আমি কিন্তু তোমাকে একেবারে ভুলে যাবো--লেখাকে প্রবীর জীবনেও জানতো না!"

সে ধীরে ধীরে উঠে চলে যায়।

মাস তিনেক পরের কথা! যথাসময়ে লেখার বিয়ে হয়ে গেছে, সে

চলেগেছে বাংলার কোন সুদূর প্রদেশে তার স্বামীর কাছে, যাবার সময় সে অজস্র কেঁদেছিল প্রবীরের জন্য, যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গাড়ীতে উঠে প্রবীরের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ! ফুটফুটে জোছনায় তার সাদা ধবধবে বাড়ীটা বিধবার সাদা বস্ত্রের আড়ালে আধ-দেখা উদ্বেলিত শুভ্র যৌবন, বাড়ীটার যেন প্রিয়তম মরে গেছে, তার শেষ শয্যার পাশে প্রিয়তমার অপ্রকৃতস্থা হাসি ! অঙ্গের আভরণের, দেহের বস্ত্রের সচেতন স্থান বিবেচনা নাই ! বাড়ীটা যেন লেখার দিকে তাকিয়ে হাসলো, ঠিক প্রবীরের হাসি, ও হাসিতে যেন হিংস্র তীব্র ভাব, সে যেন মুখ বাড়িয়ে লেখার স্বামীকে দেখতে চায় ! লেখা সশব্দে ঘোড়ার গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করে স্বামীর বুকে মাথা রেখে অঝোরে কাদতে থাকে "প্রবীরদা তুমি খুন করতে পার ?—"তার মন নিঃশব্দে চিৎকার করে বলে ওঠে ! ট্রেন ছেড়ে দিল—লেখা মুখ বাড়িয়ে তার সহরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, এ সহরের প্রতি ধূলির সঙ্গে ওর পরিচয়—সকলের অজ্ঞাত নিগুঢ় স্মৃতি। দূরে পয়েন্টস এর লাল আলো —প্রবীরের জ্বলন্ত চোখ। উঃ কী ভীষণ লাল। প্রবীরের সেই হাসি। "প্রবীরদা তুমি খুন করতে পার" লেখার মন বলতে ভয় পায়। সে মুখ টেনে নেয়।

প্রবীর কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে, তার সঙ্গে এনেছে একটী অপূর্ব্ব উপসর্গ ! উপসর্গটি দেখে প্রবীরের সহরের সে অঞ্চলে বেশ একটু চাঞ্চল্য পড়ে গেছে ! অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এ অবস্থা যে ঘটবে তা তারা বহু পূর্ব্বেই জানতেন, এতোদিন সে এ রকম একটী উপসর্গ প্রবীরের পূর্ব্বে বসেনি এটাই নাকি আশ্চর্য্য।

উপসর্গটী একটী মেয়ে ! প্রবীর তাকে কোথায় পেলো, কী জন্যই বা এনেছে, এ সম্পর্কে সে চক্রে নানাবিধ অভিমত বেরিয়ে গেল। বিমিশ্র লোক, বিভিন্ন অদ্ভূত অদ্ভূত অভিমত। প্রবীরের চরিত্র সমন্ধে, তার বাল্যকালের ইতিহাসের সূত্র টেনে, তার দৈনন্দিন কার্য্য তালিকা দেখে,

তার জীবনের সূচী পত্র কল্পনা করে অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য প্রকাশিত হতে লাগল ঐ মেয়েটীকে ঘিরে! কেউ কিন্তু প্রবীরকে সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসা করেনি তারা অবিশ্বাস করেছে, আনন্দ পেয়েছে, উপভোগ করেছে। দু একজন প্রবীরকে জিজ্ঞাসা করায় সে হেসে উত্তর দিয়েছিল—"কলকাতার সকলকে আপনারা চেনেন নাকি?" কিন্তু প্রবীর তার দু একজন বন্ধুকে বলেছিল যে মেয়েটী ঝি! "যে কাছা খোলা লোক ভাই--জিনিস পত্তর দেখার একটা লোক দরকার ত।

মেয়েটী সত্যিই ঝি। প্রবীর যে মেসে উঠেছিল ও সেই মেসেই কাজ করতো। বাবুদের বালিস বিছানা রোদে দেওয়া, ধোপার হিসাব রাখা; তাদের বিছানা পেতে রাখা, এটা ওটা করা, বাবুদের চা করে দেওয়া অর্থাৎ, তাদের সৌখিন কাজগুলো সবই রমা করতো! রমাকে নিয়ে কাটতো বাবুদের জীবনের অবসর মুহূর্ত্তগুলো। প্রত্যেক বাবুই চেতো তাকে বেশীক্ষণ নিজের ঘরে কাজে ব্যস্ত রাখতে, চতুর্পাশ্ব থেকে শুধু ডাক আসে--"রমা-রমা"। রমা হেসে ঘরে ঢুকে বলে বাবু যে একেবারে অধৈর্য্য হয়ে পড়েন--সবইতো করে গেছি আপনার "বাবুর কোনও কাজ থাকে না শুধু একবার রমাকে দেখার স্পৃহা।

"আপনার ত একার জিনিস নই বাবু--সব সময় আপনার চোখের সামনে থাকি কী করে' রমা হাসে। বাবুযেন কী একটা উত্তর দিতে চায় রমা সেটা না শুনে বেরিয়ে আসে। ভাগ্যক্রমে প্রবীর ঠিক সেই মেসেই আশ্রয় নিয়েছিল। তারপরে প্রবীর তাকে নিয়ে আসে তার বাড়ীতে।

রমা সুন্দরী অপূর্ব্ব সুন্দরী। কলকাতার এ শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে এক একটী এমন মেয়ে দেখা যায় যারা সৌন্দর্য্যে অভিজাত উচ্চ ঘরের যে কোন মেয়েকে অবজ্ঞা করতে পারে। নারীর সৌন্দর্য্য শুধু তার গায়ের' বস্ত্রএর ওপর নির্ভর করে না। নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার অপূর্ব্ব বর্ণ নয় তার অপরূপ দেহ। পুরুষ যে কোন সুন্দরী নারীর রং পেতে পারে কিন্তু

তার দেহ তার বৈশিষ্ট, তার অঙ্গের প্রতি স্তর তার বিশেষত্ব। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত প্রতি রোমকূপ তার বিধাতার অদ্ভুত কীর্ত্তি ঘোষনা করছে। বিধাতা, স্বার্থপর। রমার ছিল দেহ, যে দেহ নিয়ে সে পৃথিবী জয় করতে পারে, সে দেহ দিয়ে সে মুসোলিণীকে যে কোন মুহূর্ত্তে সামান্য পুরুষে পরিবর্ত্তিত করতে পারে, হিটলারকে দিয়ে তার শ্রেষ্ঠ শত্রুকে ক্ষমা করিয়ে দিতে পারে। রমাকে দেখলে মনে পড়ে যায় শরৎ বাবুর সাবিত্রীকে। তার দেহের প্রতি স্তরে স্তরে যৌবন কথা বলছে, পুষ্ট নিটোল বাহু থেকে আলতা পরা পায়ের পাতা পর্য্যন্ত রমা সুন্দর! সাধারনতঃ এ শ্রেণী মেয়েরা হয় গরীব কিন্তু এদের দেহ দেখে দারিদ্রের কোন লক্ষনই বোঝা যায় না বিধবার স্বাস্থ্যের উন্নতির মতোই এদের স্বাস্থ্য রহস্যাবৃত! রমা ঠাসা, নিরেট, ভরা যৌবন! দেখে মনে হয় বয়স বছর চোব্বিশ পচিশ হবে কিন্তু প্রবীরের কাছে সে বলেছিল কুড়ি বছর। এমন অনেক মেয়ে দেখা যায় যারা বয়স অনুপাতে কিছু বেশী বাড়ন্ত হয়। অভিজাত ঘরের মেয়েদের মতো দেহের প্রত্যেক অঙ্গকে নিবিড় ভাবে বেধে প্রকাশ করে না এরা দেহকে সচেতন যত্নে প্রতি পালিত করে প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে পূর্ণ দেখতে চায়। এমন দেহের একটা বিশেষ আকর্ষনী শক্তি আছে। মাথার ওপর যে লাউয়ের গাছটী লকলকিয়ে সুগোল আগাগুলো এদিক ওদিক ছুড়ে দ্যায় সে অনায়াসে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সত্যিই সেটা দেখে তৃপ্তি হয়। রমা ঠিক এই রকম সুন্দরী। মাথায় এক রাশ কালো চুল পিঠে ছাড়িয়েও অনেক দূর লতিয়ে পড়ে। ঠোট দুটো সর্ব্বদা পানের রসে রক্তিম হয়ে থাকে। তিন বেলা স্নান করে' পিঠময় একরাশ চুল ছড়িয়ে দিয়ে শুকিয়ে নেয়। স্নানের পর সে গায়ে জামা দেয় না সে সময় তার দেহ ঠিক মন্দিরের পাথরের দেবতার অঙ্গের মতো শীতল (যে অঙ্গে সর্ব্বদা জল আর ফুল পড়েছে)। সেখানে ইচ্ছে হয় একবার গড়িয়ে নিতে। রমাকে সে সময় একখানা লাল পেড়ে সাড়ী পরে

ভাস্করের শ্রেষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তির মতো দেখায়। শিল্পীর মন ওঠে ভরে। প্রবীর অপলক নেত্রে দেখে, অবাক হয় তার দেহ সম্ভার দেখে। পাতলা কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার দেহের একটা অস্পষ্ট আবহাওয়া প্রবীরের শিল্পী মনকে প্রলুব্ধ করে প্রতি মুহূর্ত্তে। তার মনে হয় কোন বরফের শুভ্র উত্তুঙ্গ শিখর কেটে তার মূর্ত্তি কোন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর খোদাই করেছে। প্রবীর তার অসংখ্য ছবি আঁকছে, বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গীতে। রমা প্রবীরের গৃহলক্ষ্মী, তার ড্রয়িং রুম থেকে Studio পর্য্যন্ত প্রত্যেক কুটোটা সঠিক রাখে, সস্থানে রাখে। কোন জিনিস স্থান চ্যুত হয় না। রমা এনে দিয়েছে লেখার দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রবীর লেখাকে ভুলেছে কিন্তু তার হস্তলিপি দেখতে পায় রমার প্রতি কার্য্যের স্বচীপত্রে। এই দ্বিতীয় সংস্করনের ভূমিকা লিখেছে লেখা। ঝি রমা প্রবীরের কোন অভাব বুঝতে দেয় না, ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে প্রবীরের আরম্ভ হয় সুপ্রভাত, ঘুমের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রবীর রমাকে নিয়ে যেন একটা রঙ্গীন নেশার ঘোরে কাটিয়ে দেয়। লেখাকে ভুলে যাবার সম্পূর্ণ সুযোগ রমা প্রবীরকে দিয়েছে। সকালে পিঠময় একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে রমা প্রবীরের ঘুম ভাঙ্গাতে আসে। ঠোট দুটো লাল রসে সম্পূর্ণ সিক্ত। প্রবীর চোখ তাকিয়েই তাকে দেখে একটু হাসে। কী রকম যেন একটা মুখে ইঙ্গিত করে, সেটা শুধু রমাই বোঝে।

কী যে বুদ্ধি, দেখছোনা আমি পান খেয়েছি, তোমার তো ঠোঁট ময় লেগে যাবে।

তুমিই ত আমাকে রাঙ্গাবে রমা—সত্যি পান খেলে তোমাকে দেখে কী মনে হয় জানো--যাক্--কিন্তু ও ঠোট নিয়ে বাইরে যেয়ো না যেন।

ফের যা তা বকছ? রমা একটী রঙ্গীন ছাপ দিয়ে দেয় প্রবীরের ঠোটের ওপর। প্রবীরের পাশে বসে তার কপালে হাত বুলিয়ে দেয়, চুলগুলো নিয়ে খেলা করে তার গভীর ভেতরে আঙ্গুলের লুকাচুরি।

এ উপভোগ টুকু ছেড়ে প্রবীর উঠ্‌তে স্বীকার করে না, সে তার দিকে, তার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকে।

নাঃ---অমি না গেলে তুমি উঠ্‌বে না দেখছি---যাই আমি চা করি তুমি উঠে এসো চট্ করে বুঝলে।

রমা চট্ করে উঠে যেতে চায় প্রবীর তার আচল টেনে ধরে! রমার দেহ সম্পুর্ণ অনাবৃত হয়ে পড়ে প্রবীর প্রান খুলে হেসে ওঠে!

তোমার একটা সময় অসময় নেই, চারিদিকে চাকর ঠাকুর ঘোরাঘুরি করছে, কী মনে করবে তারা বলত, হাজার হ'ক বাড়ীর ঝি ত, রমা করুণ চোখে প্রবীরের দিকে চেয়ে থাকে। এ মুহূর্ত্তে এ স্মৃতির প্রতিমূর্ত্তি বোধ হয় সে দেখতে চায়নি--নারী।

"ফের ওই কথা--আমি আজ দু ঘণ্টা দেরী করে উঠ্‌বো। প্রবীর পাশ ফিরে শোয়। রমা তার বুকের ওপর ঝুকে পড়ে।

"আচ্ছা আর কখনো বলবো না---জীবনে না। লক্ষীটী ওঠো।"
"বলো তুমি আমার কে?"

আমি তোমার---সব, তোমার প্রিয়া। আনন্দে রমা কেঁদে ফেলে।

রমা ও প্রবীরের মধ্যে এই প্রকার ব্যবধান। তাদের এই সম্পর্কের ওপর বিমিশ্র বর্ণের আলো প্রতিফলিত হয়ে জনসাধারণের কাছে এক কুৎসিত আকার ধারণ করলো। প্রতি পদক্ষেপে প্রবীরের সমালোচনা, কে কী শুনেছে, কে কী দেখেছে প্রভৃতি বিবিধ মিথ্যা সত্যের অদ্ভুত-সমন্বয়। প্রবীরের অতুল ঐশ্বর্য্য সমাজকে তুচ্ছ করেছিল। সমাজ মানে না গ্রাহ্য করে না সেই যার পয়সা আছে যথেষ্ট। দরিদ্র সমাজের প্রতি সূক্ষ্মতম বন্ধনটাকে ভয় করে, মাথা নত করে তার দারুণ নির্য্যাতনকে সহ্য করে। বাংলার তরুণরা এনে দিয়েছে এ নিয়মের তীব্র ব্যাতিক্রম। তারা জানে দারিদ্রকে আলিঙ্গন করতে, সঙ্গে সঙ্গে তারা জানে বাংলার সমাজের পঙ্কিল পরিস্কার করে তাতে কাকচক্ষ স্বচ্ছ জল আনতে। আজ

শত শত বৎসর ধরে যে মহা পুরুষরা বাংলার সমাজকে ক্রমে ক্রমে পঙ্কিলাবদ্ধ করেছো, তাকে এতো দূরে নামিয়েছ, আজ বাংলার তরুণকে প্রণাম করো। পৃথিবীকে তরুণের হাতে ছেড়ে দাও এর স্থিতি কিছু দৃঢ় হোক। তারা অন্যকে মেরে মরতে চায় না তারা চায় নিজে মরে অন্যকে বাচাতে। তাদের কে ঘৃণা করো তারা তোমার উপকার করবে। প্রবীরের এই ইতিহাস পরিবর্দ্ধিত হ'লো। এর প্রকাশিত হ'লো অসম্ভব সস্তার বিরাট সংস্করণ। লেখার কানে গিয়ে যা পৌছল তাতে লেখা অসম্ভব কাঁদলো, দুদিন উপোস করে ঠাকুরকে পূজো দিল মনে মনে কী যেন মানত করলো! লেখা উপোষ করে, কেঁদে শরীর ভেঙ্গে ফেলে চলে এলো তার বাবার কাছে!

লেখা প্রবীরকে ফেরাতে এসেছে।

লেখা এসে যা শুনলো তাতে সে কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে দিলো। পথে পথে, লোকের মুখে মুখে প্রবীরের কুৎসিৎ চরিত্রের তীব্র ঘৃণা সমালোচনা লেখার সমবয়সি বন্ধুরা এসে তাকে নানা উপায়ে প্রবীর ও রমার বিষয় বহু বর্ণে অঙ্কিত করে শোনাতে লাগল, তাদের শোনাবার একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তাদের গল্পের মাঝে মাঝে ঠোট চেপে বিশ্রী অর্থ পূর্ণ হাসিতে লেখা চমকে ওঠে। তার প্রাণ অসার শূন্য হয়ে ওঠে! লেখা নিজের ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে, তার মৃত্যু হ'লো না কেন এ বৃত্তান্ত শোনার আগে, প্রবীরদার মৃত্যু হ'লো না কেন তার সম্পর্কে এ ইতিহাস শোনার আগে! "প্রবীরদা একী সত্যি!" লেখায় মন বিশ্বাস করে না প্রবীরদা, তার প্রবীরদা তাকে ছাড়া যে কোন মেয়েকে চেয়েও দেখতো না! সেই প্রবীরদা? "লেখাকে প্রবীর জীবনেও জানতো না, কথাটা এখনো তার কানে বাজছে, ওর প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার শিরায় প্রতিশিরায়। একী লেখার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। প্রবীরদা একী প্রতিশোধ। লেখা কাঁদে শুধু কাঁদে, যতো নিরুপায় হয় তত কাঁদে; যতো কাঁদে ততো নিরুপায় হয়।

লেখা প্রবীরকে অনুরোধ করলো, ভিক্ষা চেলো, পায়ে ধরে কাঁদলো! সে আর প্রবীরের নিন্দা শুনতে পারে না, তার প্রাণ ফেটে যায়! লেখার ভিক্ষা শুনে প্রবীর হাসে! উঃ বিভীষিকা হাসি।

"একটা লোক দরকার লেখা, একা আর পেরে উঠিনা। একটা মেয়ে মানুষ না হলে সত্যি দৈনন্দিন জীবন চলে না।

এতোদিন কী করে চলেছে।

"এতোদিনের কর্ণধার ছাল ছেড়েছে---তাই বলে তো আর নৌকোডুবি হতে পারে না।

এতোদিন যে করেছে সেই তোমার সব করবে, প্রবীরদা আমাকে আর কষ্ট দিও না তোমার পায়ে পড়ি।

লেখা প্রবীরের বুকে মাথা লুকিয়ে কাদে। প্রবীরের আনন্দ লাগে। সে তৃপ্তি পায়। না হয় তুমি বিয়ে করো আমার মুখ আর পুড়িয়ো না প্রবীরদা।

কী দরকার বিয়ের, রমাই কাজ চালাচ্ছে। তোমার মুখে আলো দেবার সূর্য্য আর প্রবীর নয় এখন।

রমা প্রবীরের কথার প্রথমাংশ শুনে চমকে ওঠে, তবে কি সত্যি! ছিঃ ছিঃ একটা বাড়ির ঝি।

আচ্ছা প্রবীরদা পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার পরিবর্ত্তে তুমি একে ত্যাগ করতে পারবে--লেখা মরিয়া হয়ে প্রশ্নটা করে। এর উত্তর কী হতে পারে তা লেখা কিছু অনুমান ও করেছে এবং অনুমান করে ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠেছিল। পুরোন দৃশ্যের পুনরভিনয় হয় বুঝি। তা হোক—লেখা আর পারে না। প্রবীরকে সে কী চোখেই দেখেছিল—উঃ কেন সে প্রবীরকে ভালবেসেছিল।

"ছিল এখন আর নাই। আমার এ নিন্দার জন্য দায়ী কে লেখা। প্রবীর হিংস্র ভাবে তার দিকে তাকায়। সবল দুর্ব্বলকে, অসহায়কে

নির্য্যাতন করে আনন্দ পায়। ভালবাসায় নীচু হ'তে নেই—বাংলার যুগে যুগে নারী দুঃখের ইতিহাসের এটাই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র কারণ, সে উঁচু দিকে তাকিয়ে পুরুষকে ভালবেসেছে।

আচ্ছা প্রবীরদা তোমার দান এখন নিলে তুমি আমার অনুরোধ রাখবে? ওকে বিদায় করো অমাকে বাঁচাও প্রবীরদা তা না হ'লে তোমার জন্য আমি আত্মহত্যা করবো, লেখা তার চোখের জল দিয়ে প্রবীরের বুক ভিজিয়ে দেয়। লেখা নিজেকে উত্তুঙ্গ শিখর হ'তে প্রবীরের লায়ে ফেলে দিয়ে চুর করেছিল। অন্য উপায় লেখার ছিল না। প্রবীরকে সে বাঁচাবে নিজেকে সে বাচাবে।

প্রবীর মনে মনে অট্টহাসি হাসে। গর্ব্বের দীপ্ত লালিমা তার মুখকে মুহূর্ত্তে রক্তিম করে দেয়। দুর্ব্বলকে জয় করে সবলের হিংস্র হাসি।

কিন্তু এখন—তোমার স্বামীর—

"প্রবীরদা" লেখা অশ্রুশিক্ত চোখে তার দিকে তাকায়, তার কাণায় কাণায় উপছে পড়েছে করুণতা, ভিক্ষার আবেদন। "প্রবীরদা আমাকে অবিশ্বাস কয়োনা প্রবীরদা, আজ পর্য্যন্ত সে আমাকে—লেখা আর বলতে পারে না। সে কাঁদে, সে ব্যথা পায়।

কয়েকদিন পরে লোকে শুনে আশ্চর্য্য হ'লো যে প্রবীর তার ঝিটাকে বিদায় করেছে। সকলে অভিমত প্রকাশ করলো যে এটা ঘটবে তারা জানতো। হাজার হ'ক ছোট লোকের মেয়ে---ডাইনীর আবার প্রেম! আর একটা অভিমত প্রকাশিত হ'লো, আরে গিয়েছে কী আর সাধে দেখো ঝেড়ে ঝুড়ে আবার দু চার দিন পরেই আসবে।

শুনে লেখা আর প্রবীর হেসেছিল।

—(:০:)—

এখানে সেখানে
ও
পথের ধুলায়।

রিপনের বৈকালিক ল'ক্লাশ সবেমাত্র শেষ হয়েছে-বন্যার জলেরমতো এক সারিতে ভাবী উকিলরা তেতালা থেকে নেমে আসছেন; সিড়ি একটাই সুতরাং অবতরনের মূল্য বেশী, চেষ্টা অসহনীয়! আমি এই ভিড়টাকে বড় ভয় করি তাছাড়া বিশেষ তাড়াতাড়িও নেই তাই রোজই ক্লাশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নামবার চেষ্টা করে বন্যা প্রবাহে গা এলিয়ে না দিয়ে কিছুক্ষণ (বেশ ক্ষানিকক্ষণ) রেলিংএ ভর দিয়ে ভাবী উকিলদের প্রবাহ দেখি! শুধু নরমুণ্ড! কাল কুচকুচে বিবিধ রকমের মাথা, ওপর থেকে মনে হয় শুধু কতকগুলো মাথাই নেমে যাচ্ছে! তেতালা থেকে বোধ হয় দপ্তরী পাঁচ পিপে কালো কালী ঢেলে দিয়েছে! এতো উকিল কী করবে? যাই করুক! যে যার পেটের চিন্তা করে, উদরপুর্ত্তি জীব মাত্রেই করতে পারে রাস্তার কুকুরও! ওটার কোন মূল্য নেই! আমিও নীচে নেমে আসি; নীচের ছেলেরা মাঠের আবদ্ধ জলের মতো ওপরের তীব্র জলের সঙ্গে মিশে পরিমান বাড়ায়, বেগ কমে আসে! তারপর হয় তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ততা! চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বড় রাস্তায় এসে পড়লাম—পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে ট্রামের অপেক্ষা করছি ট্রাম এসে দাঁড়ালো, সিগারেটটা সবে মাত্র

ধরেছে; তার বুকে তুষানল জ্বালিয়েছে চমৎকার ধোঁয়ার ধারাটী তার অলঙ্কার বিশেষ! যাক্ অত কবির চোখে তখন সিগারেটকে দেখার অবসর ছিলো না; হাত তুললাম, ট্রাম দাড়াল! পা বাড়িয়েছি—"কীরে কোথেকে-?" ট্রামের ভিতর থেকে এই প্রশ্ন! স্বভাবতঃই তাকালাম-মুখের একপাশে সিগারেটটী দুটী ঠোটের কোনের পাশে চাপা-! তাকিয়েই দেখি ছোট মামা! চট্ করে সিগারেটটী মুখ থেকে ফেলে দিলাম, মুখ থেকে পড়েই কঠিন পাথরের ওপর তারপরেই পদদলিত! এত বড় tragedy বোধ হয় ওর ভাগ্যে আর ঘটেনি। গেল এক পয়সা সব চেয়ে দুঃখ এই ভেবে যে সবে ভোগ করতে সুরু করেছিলাম এমন সময় হাত ছাড়া! ছোট মামার দিকে ভ্রুকুটি করে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম! ইচ্ছে ছিল বলি মাডাগাস্কার থেকে। এসময় কোথেকে আমার আসা সম্ভব তিনি আমার চেয়েও ভাল জানতেন বিশেষতঃ রিপনের সামনে।

কীরে উঠবিনাকি—?

ওঠা আর হ'লোনা! বল্লাম—"না একজন বন্ধুর অপেক্ষায় আছি—

গাড়ী ছেড়ে গেল।

পিছনে তাকিয়ে দেখলাম দ্বিতীয় ট্রামের দেরী আছে, অন্ততঃ পক্ষে সেখানা চক্ষুর অন্তরালে এখনো! সুতরাং—আরেকটা সিগরেট ধরিয়ে পা বাড়ালাম! চলতে চলতে ছবিঘরের সামনে এসে গেছি-অসম্ভব ভিড়! মুখ দেখে মনে হ'লো অধিকাংশই ব্যর্থের দল! এটা বোধ হয় সব ক্ষেত্রেই তাই! King Kong ছবি দেখান হবে! সামনে এক বিরাট ছবি টাঙ্গিয়েছে বিশ্রী অসভ্য এক বন্য জন্তু তার বিশাল মুঠের মধ্যে এক তন্বী তরুণীর অর্দ্ধ উলঙ্গ দেহ ধরে, তরুণী দেহের লোভনীয় অগ্রভাগ এলিয়ে পড়েছে! পশুর প্রেম আছে সেও যখন এর আস্বাদ পেলো উন্মাদ হ'লো! নারীর দেহের স্বাদ তাকেও ক্ষিপ্ত করতে পারে! সে দেখলো যে নারীর চুমুতে তার দেহের সুগোপন কোমল অঙ্গের স্পর্শে সমস্ত শরীরে এমন একটা

রোমাঞ্চ এনে দেয় যেটা সম্ভব হয়না বিশাল অরণ্যের স্নিগ্ধ মর্ম্মরে যেটা দিতে পারিনি তার বন্য স্বাধীনতা, বনের উদার জীবন তার স্ফটিকস্বচ্ছ ঝর্ণার জল, সভ্য জগতের অজ্ঞাত সুমিষ্ট ফল ও পানীয়। এমন কী তার জাতে নারীও দিতে পারিনি! এই পশুর প্রেম জেগে গেলো এক মানবীর যাদু স্পর্শে! মানুষের নারীর দেহের স্বাদ জগতে সবচেয়ে সুমিষ্ট! এই পশু তার একটা চুমু পুনরায় পাবার জন্য উন্মাদ হ'য়ে ছুটেছে।

এটা শ্রেষ্ঠ সত্য। পশু ও মানুষে বিশেষ তফাৎ নেই! আদিস্তর পশুত্বে! পশুত্বে মানুষের জন্ম। সভ্যতা মানুষকে একটা পর্দ্দা এনে দিয়েছে—সে ক্রমে ক্রমে হয়েছে rational, Animality তার প্রধান বিষয় বস্তু!

হাঁটতে হাঁটতে বহু বাজারের মোড়ে পেঁাছে গেছি! দাড়াবার কী যো আছে—কলকাতা সহরে দাড়ালেই একভীষন কাণ্ড হ'য়ে উঠ্‌বে! দাড়ানো এক সমস্যা! কাগজের হকার আর ভিখারী—দুটোই সহরের কীট বিশেষ হয়ে দাড়িয়েছে! সকালের কাগজ হাতে উঁচিয়ে ধরে তাদের তাজা খবর দেবার অসীম প্রয়াস ও অমানুষিক চীৎকার এক মুহূর্ত্তের জন্য ক্লান্তি বোধ করেনা!

"একটা আধ্‌লা দিন বাবু—দুদিন খাইনা—" ছোট্ট একটা ছেলের হাত ধরে অন্ধ এক এসে সামনে দাঁড়ালো! এরা যেন জেঁাক! মৃত্যু হ'লে এদেরও দারিদ্র ঘোচে, আমরাও এদের হাত থেকে বাঁচি! একবার তাকালাম, পর মূহূর্ত্তেই পা বাড়ালাম শেয়ালদার গেটের দিকে-ট্রামে চাপ্‌বো! অন্ধের ক্ষীণ কণ্ঠের শেষ রেশটুকু তখনো যেন কানে বাজছিল! "দুদিন খাইনি বাবা-" বেশ করেছ! খাওনি তো আমি কী করবো! পর্য্যায়ক্রমে কষ্ট ভোগ, অনশন, অত্যাচার-এসব চলবেই! পৃথিবীতে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না-পারলেও করা উচিত নয়! দুর্ব্বল অত্যাচার সহ্য করুক-ভিক্ষা চেয়োনা কাপুরুষ! সবল হও, প্রতিশোধ নাও,—নয়তো মরো! আর্ত্তনাদ তোমার এই জন-কোলাহল মুখরী

পৃথিবীতে কে শুনবে? আমার পাশের এক ভদ্রলোক বিনীত ভাবে তাকে জানালেন—"মাপকর বাবা-হবেনা!" তিনিও আমার পিছু ধরে এধারে এলেন! প্রৌঢ় ভদ্রলোক! নিশ্চয়ই কোন অফিসের কেরাণী যেখানে ঢুকেছিলেন সেই ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করেই! হাতে একটা ব্যাগ তার ভেতর থেকে কী যেন একটা শাক উঁকি দিচ্ছে! বুঝলাম বৈঠকখানা বাজার ফেরৎ! ট্রাম ডিপোর সামনে এসে দাঁড়ালেন আমিও! হাইকোর্টের ট্রামখানা বেরিয়ে গিয়ে সে স্থানটা একটু জন বিরল হ'য়ে গেল! ঠিক অফিসটার সম্মুখে! কানে গেল "একটা পয়সা দিন বাবু!" দাবী বেশী! তাকালাম! একজন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত শীর্ণ লোক তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে আছে। চেহারায় মনে হ'লো বাঙ্গালী, তার বাঁ হাত ধরে দাড়িয়ে আছে একটা মেয়ে! বছর উনিশ বয়স হবে, তার স্বাস্থ্যে দারিদ্রের কোন লক্ষণ দেখলামনা! বাঙ্গালী দরিদ্র ঘরের মেয়েরা অনশনে অদ্ধাশনে বয়সোচিত স্বাস্থ্যটী ঠিক পায়—বিশেষ কতকগুলো অঙ্গ তাদের ঠিক উদ্বেলিত হয়ে উঠে। ভদ্রলোকটী তাঁর চতুঃপার্শে একবার চট্‌করে চেয়ে নিয়ে মেয়েটীরদিকে তাকালেন! কোটরগত চক্ষু দুটী মাথার ওপরের আলোতে একটু উজ্জলতর দেখলাম! লালসা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুরা-এই সুরা কদাকার মানুষকেও মুহূর্ত্তের জন্য সুন্দর করতে পারে-উজ্জল করতে পারে! মেয়েরা সাধারণতঃ পুরুষের চেয়ে দেখতে ভাল এই জন্যই—সর্ব্বদা লালসাপূর্ণ! পেটের চিন্তায় পুরুষের (ধনীরা নয়) সৌন্দর্য্য যায় মরে অর্থাৎ লালসা থাকে না এক বিন্দুও! মেয়েরা এই সুরার শ্রেষ্ঠ পাত্র! প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী পকেট থেকে বোধ হয় একটা পয়সা বের করে তার হাতে দিলেন-দান করে পরিবর্ত্তে তিনি মেয়েটীর বুকের একপাশ ধরে একটু ঝাঁকি দিয়ে দিলেন—মেয়েটার সমস্ত বুকখানা কেঁপে উঠলো! 'ধ্যেত্'—শব্দটুকু শুনতে পেলাম! বুঝলাম-

মেয়েটীর হাত ধরে যে অভিভাবকটী প্রবহমান জন স্রোতের দিকে হস্ত প্রসারিত করে আছেন—তিনি অন্ধ !

একখানা ট্রাম এসে দাঁড়ালো।

তাকিয়ে দেখি এস্‌প্ল্যানেড্‌এর ট্রাম-হোকগে ! কঁাহাতক আর দাড়িয়ে থাকা বায় ! এই টুকুতো যাবো-স্থরেন ব্যানার্জ্জী রোডে মাসী বাড়ী ! ধর্ম্মতলায় নেমে পড়ে গলি ধরবো ঠিক করলাম ! তখনো আমার মাথায় ঐ ভদ্রলোকটীর কথাই এঁকে বেকে, বিচিত্র এবং বিভিন্ন শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! সখ দেখে হাসি পাচ্ছিলো—বাড়ীতে নির্জ্জন স্থান হ'লে হয়তো আমার কুঅভ্যাস মতো বীভৎস চীৎকার করে' হেসে উঠ্‌তাম ! ট্রাম ভরা লোক স্থতরাং ও আনন্দ টুকু চাপা দিতে হ'লো ! মানুষের বয়স কোন স্থানে পৌছলে তার লালসা যায় মরে, নারীর বিশিষ্ট অঙ্গ স্পর্শ করার স্পৃহা, তার দেহের স্বাদ পাবার লিপ্সা শূন্য হয়ে তাতে বিশ্বপ্রেমের আভাস ফুটে ওঠে তা ঠিক এখনো বুঝে উঠতে পারিনি মনে হয় তাদের ও জ্ঞানটুকু বেশ টনটনে থাকে ! অনিচ্ছায় চাপা দিতে বাধ্য হয় সমাজের ভ্রূকুটিতে, সনাতনী সংস্কারের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য ! এক জন বৃদ্ধ একজন তরুণীকে কী করে আদর করেন নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তা দেখেছেন ? তাঁর প্রত্যঙ্গ স্পর্শের গতি ও স্থানস্থিতি দেখবেন ! বার্দ্ধক্য তাকে স্থযোগ ও স্থবিধা এনে দিয়েছেন ! ভেতরে তাঁর সঙ্কুচিত রোমকূপে তখনো রোমাঞ্চ হয়, চোখের পাতা আসে বন্ধ হয় ! বাইও লজিতে বলে অনুভূতির প্রভাব সর্ব্বত্র—স্নায়ুর বল বুঝে কম এবং বেশী ! তখনো ভদ্রলোকের চেহারাটাই বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ছিল, অভিরুচি তার অদ্ভুত ! একজন রাস্তার ভিক্ষুক কন্যা ! অভিরুচি ভুলে যায় ! কুড়ি বছরের মেয়ে ভিক্ষুক কন্যা নয়।

মোড়ে এসে ট্রামখানা দাঁড়ালো !

গাড়ীখানার স্থিতি বেশীক্ষণ দেখে একটু কৌতুহল হ'লো-নিশ্চয়ই কোন মহিলা উঠ্‌বেন, তা না হ'লে কম্পানীর এতো দয়া হবে কেন !

এক তরুণী উঠে আমার বিশ্বাস সফল করলেন, কৌতুহল নিবৃত্ত হ'লো-কিন্তু যে অনুভুতিটুকুর সৃষ্টি হ'লো সেটুকু অবর্ণনীয়, তাজা, প্রার্থনীয় ! মনে করবেন না একজন মেয়ে দেখে এই অনুভুতিটুকু এলো-অত দরিদ্র আমি নই ! তরুণীটি আর কেউ নয় সে মহুয়া ! বন্ধু পত্নীর এমন অপ্রত্যাশিত নিঃসঙ্গ সঙ্গলাভ লোভনীয়ই বটে ! আমার দিকে দৃষ্টি যেতেই একটু মুচ্‌কে হেসে এগিয়ে এলেন—" কোথায় চলেছ ?—ফোন করে' না পেয়ে সোজা তোমার বাসায় গেছলুম—কী লাক্‌- ! এমন দেখা হবে—

সাড়ীর আচলটা ঠিক করে পাশে বসে পড়লেন ! "কেন হঠাৎ এতো খোঁজ—মাংস রেধেছ নাকি ?—

মাসী বাড়ী আর যাওয়া হ'লোনা-হওয়া উচিতও নয় ! সোজা আমার গন্তব্য গলি পাড় হ'য়ে গেল !

"মাংস তোমার এত প্রিয় কেন বলোতো ? মাংস মাংস করে' যে ক্ষেপে যাও।"

"হিংস্র জন্তু কিনা-ওরই স্বাদ শুধু বুঝেছি ভোজনে বিলাসে, ওটাই আমাদের আদি ও মৌলিকগুন !"

"দুখানা টালিগঞ্জ-!" মহুয়ার এই আদেশ ট্রামের কণ্ডাকটার ঠিক বুঝতে পারলো, ঠিকমতো সে বাকী পয়সা ফেরত দিয়ে দুখানা টিকিট দিল !

"অর্থাৎ ? একেবারে তোমার বাড়ী নিয়ে চল্লে নাকি ? এইরাতে ?"

"এই রাত বলেই নিয়ে যাচ্ছি দিন দুপুর হ'লে তোমাকে সচ্ছন্দে কলেজ স্‌কোয়ারে নামিয়ে দিয়ে আসতুম !

"ফিরবো কখন ? অতরাতে—

"দ্যাখ তোমাদের এই বুড়ো ন্যাকামি আমার 'গাত্রদাহ' বাড়িয়ে দেয় যেন ফিরবার চিন্তাটাই ওঁর বেশী! যদি বলি কাল সকালে! আজরাতে আমার কাছে শোবে-অর্দ্ধ শয্যা তোমার! আপত্তি আছে! ভদ্রতা করবে?"

সামনে সিটের এক ভদ্রলোক পেছনে তাকিয়ে নিজের কানকে বিশ্বাস করে নিলেন! মহুয়া আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, আমার হাতখানা তার দুই উরুর মধ্যে চেপে ধরলো; ভদ্রলোকের ভ্রু একটু কুঞ্চিত হ'লো কপালে দু একটা রেখা উঠ্‌লো ফুটে; মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা বিড়ি ধরালেন!

"দেখলে তো! ওঁর সনাতনী সংস্কারের খোঁচাটুকু বিড়ির ধোঁয়াতে ঢাকছেন! ওটা হিংসা, বুঝলে! একটু একান্ত জায়গায় যদি ওঁর হাতখানা আমার বুকে চেপে ধরে থাকি, আর একখানা বাড়িয়ে দেবেন!"

উত্তর দিলাম না; তবে আমার হাতখানা তার নিটোল জঙ্ঘার উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা হ'লোনা! অনুভূতির একটা তৃপ্তি আছে!

এস্‌প্ল্যানেডে গাড়ী বদল করলাম!

এস্‌প্ল্যানেড্ থেকে বালীগঞ্জ কিংবা টালিগঞ্জ এই পথ টুকু আমার সব চেয়ে প্রিয়। সন্ধ্যায় দূরে আলোগুলোর দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হয়! ওরা হাসে, ইসারায় ডাকে ওদের আলোর ছায়াপথের ওড়নাটা খুলে আদর করতে! কালো কুচকুচে একরাশ চুলের মধ্যে যেন চিনে সিঁদুরের সিঁথি। বাঙ্গালী মেয়েদের এটাই সবচেয়ে মার্জ্জনীয় জগৎ-শ্রেষ্ঠ ভূষণ! বাঙ্গালী হিন্দু জানে সৌন্দর্য্যের মৌলিক পূজা, তার যথাযথ স্থান বিশেষণ। মহুয়ার সিঁথির দিকে একবার তাকালাম! আধুনিক হাওয়া ওর সিঁদুর মুছেচে! দূরের আলোগুলো ছুটে চলেছে-যাবার পথে প্রতি মুহূর্ত্তে আলিঙ্গন করছে অন্ধকারকে! চৌরঙ্গি থেকে দূরের এই দৃশ্যটা সত্যিই লোভনীয়! দূরে ট্রামগুলো যেন একটা আলোর মালা! সিঁদুরের

টিপ্ গুলো জ্বল জ্বল করছে! এপাশে অবিরাম জনস্রোত বিরামহীন চাঞ্চল্য! বৃষ্টি যদি হয় ঝম্ ঝম্ অবিরাম, অশ্রান্ত, ভীষণ বেগে! কী আনন্দ টাই না হবে! বৃষ্টিতে কখনো এসপ্ল্যানেড্ থেকে বালীগঞ্জ ট্রামে দৌড় দিয়েছেন? নিশ্চয়ই দেননি! দিলে এক্ষুনি হাততালি দিয়ে উঠতেন! বৃষ্টি হলেই আমি ছুটে আসি সেই নিউ পার্কস ষ্ট্রীট্ থেকে এই সুখ টুকু পাবার জন্য! বৃষ্টির ওড়নার নীচে যেন প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের শুভদৃষ্টি হচ্ছে! বিয়ের উন্মুক্ত আসরে বর বধুর শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত! রাস্তার কুকুর থেকে সুরু করে ভিক্টোরিয়া হাউসের চূড়া, লেড্লর শীর্ষ, প্রতি ল্যাম্পপোষ্ট, রিক্স্ ওয়ালা, দূরের আলোগুলো, মেমোরিয়ালের লগ্ন শুভ্র-দেহ, সব প্রাণ খুলে ভাল বাসছে, প্রত্যেকটা পদার্থ যেন বলছে Hold your tongue and let me love চুপ করো শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত ভাল বাসবার! ইচ্ছে হয় ফারপো থেকে সাহেব মেম গুলোকে টেনে এনে বাইরে দাড় করিয়েদি! ওরা ভোগ করতে পারে, উপভোগ করতে পারেনা, বই লিখতে পারে, ভূমিকা পারেনা।

আমরা দুজনে চুপ! মহুয়ার দেহের স্পর্শ লাগছে আমার অঙ্গের এক পার্শ্বে! আমার একখানা হাত সে গলার ওপর দিয়ে বুকের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে বুকের উষ্ণতার অনুভূতি পাচ্ছি! এস্থানে, এসময়ে কথা বলতে নেই! এখানে ভাববার আবশ্যকতা নাই আবশ্যকতা শুধু স্পর্শের, অনুভূতির, রোমাঞ্চের!

যেখানে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি সেখানে ভাষা নেই, আলো নেই চোখ নেই!

মহুয়ার বাড়ী পেঁাছে শুনি তার স্বামী কলকাতাতেই অনুপস্থিত; কম্পানীর কাজে গিয়েছে পাটনায়! এরকম অনুপস্থিত সে প্রায়ই হয়, রাতে মহুয়াকে পাহারা দেবার জন্য আমার উপস্থিতি দিয়ে তার অনুপস্থিতির অভাব ও অসুবিধা টুকু দুর করতে হয়! বন্ধু ও বন্ধুপত্নী এক ধারে! দাবী বেশী, মুল্য অমূল্য!

রাত তখন কটা হবে ঠিক বলতে পারলাম না; কারণ আমার শোবার ঘরছিল অন্ধকার! এই ঘরটায় থাকে মহুয়া ও তার স্বামী আমার বন্ধু বাইরে ঝমাঝম্ বৃষ্টি, কাচের জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোতে দেখা যাচ্ছে তাদের কুয়াসাচ্ছন্ন ধারা, কাঁচগুলো বেয়ে অবিরাম জল পড়ছে কী সুন্দর ঠাণ্ডাই না জানি হয়েছে ওটা যেন কোন-স্নান-করা মেয়ের গাল ইচ্ছে হয় ওখানে ঠোট রাখতে ওটা যেন কোন মন্দিরের পাথর বাঁধানো জায়গা, ইচ্ছে হয়, ওখানে একটা গড়াগড়ি দিতে! ইচ্ছে হচ্ছিল উঠে গিয়ে দি জানালা গুলো খুলে, বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এসে ঘরে আশ্রয় নিক্-ওরা বাঁচুক! ওরা একটু উষ্ণতা খুঁজুক ঘরের মধ্যে, খাটের নীচে, আমার জামার পকেটে, মহুয়ার ব্লাউজের মধ্যে সাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে; আমাদের গায়ের চাদরের মধ্যে! ইচ্ছে হচ্ছিল যে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলেদি, বৃষ্টির ঝাপ্টা এসে ভিজিয়ে দিক আমার মুখ মহুয়ার অলকগুচ্ছ! বাইরে তাকিয়ে দেখি রাস্তাটা যেন এক টুকরো নদী! জল ভরা রাস্তায় হেঁটেছেন কখনো? নিশ্চয়ই হাঁটেননি, তা'হলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তেন! প্রতি পদক্ষেপে শ্রেষ্ঠ অনিশ্চয়তা, শ্রেষ্ঠ আনন্দ। প্রতি পদক্ষেপে পায়ের নীচে পাবো শক্ত পীচের রাস্তা, স্খলনের ভয় নেই, এ জানা থাকলে এক-জন অন্ধও চোখ বন্ধ করে পা ফেলতে পারে! ওতে আনন্দ নেই, মনুষ্যত্ব নেই! ইচ্ছে হচ্ছিল ত' অনেক কিছু, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তে উঠে ইচ্ছা পূর্ণ করার অবসর ছিলনা কারণ—!

মহুয়া উঠে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তার সাড়ী, ব্লাউজ, চুলের কাঁটা অন্ধকারে বিছানার ওপর থেকে খুঁজে কুড়িয়ে নিলো! টেবিলের ওপর থেকে আইসক্রিম সোডা দুটো ভেঙ্গে একটা সে খেলো একটা আমি! ক্লান্তির একটু উপসমতা এলো! সে চলে গেলো পাশের খাটে শুতে! সেটা তার খাট, আমি সেটাতেই রইলাম সেটা তার স্বামীর! একই ঘরে স্বামীস্ত্রীর বিভিন্ন খাট আভিজাত্যের একটা অঙ্গ!

তুমি এখানে থাকো-নয়তো সারারাত আমাকে ঘুমুতে দেবেনা বড্ড tired বোধ কচ্ছি! সোডা রইল দরকার হ'লে ভেঙ্গে নিও—

—পুনরায় অন্ধকার!

সকালে চায়ের সময়টা মহুয়ার ওখানেই কাটিয়ে বাসায় ফিরছি, মহানগরী পুনরায় তার প্রতি মুহূর্ত্তের চাঞ্চল্যে ও ব্যস্ততায় নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে! গতরাতের একটা কথা শুধু ঘুরে ফিরে' আমার কাণে তার স্মৃতির প্রতিধ্বনি শোনাচ্ছিল!

"আচ্ছা-তোমার স্বামী থাকতে আমাকে মাঝে মাঝে রাতের অতিথি কর কেন মহুয়া?"

"আয়নায় চেহারাটা ত' দিনের মধ্যে দশবার দেখছ! চেহারার প্রসংশা আমার মুখে তোমার বেশী মিষ্টি লাগে নাকি? মেয়ে মানুষ হ'লে বুঝতে কেন তোমাকে চাই! কেন? হঠাৎ এ প্রশ্ন? আমার ভালবাসার কী কোন মূল্য নেই! তোমাকে কী আমার স্বামীর আগে চিনিনি?

মহুয়ার চেহারায় বিশ্ব নারীর প্রতিমূর্ত্তি দেখেছি!

* * *

সেদিন ছিল মহালয়ার ছুটি! পূজার আগে ব্যস্ত মহানগরী ব্যস্ততর হয়েছে! প্রতি মুহূর্ত্তে দুদিক থেকে অগনন জনস্রোত ছুটে চলেছে! প্রভাতের রোদে শরতের স্পর্শ পাচ্ছি! সত্যি পৃথিবীর কোন দেশে দেবতার এমন সচেতন জাগরনী আগমণী বার্ত্তা আছে কিনা জানা নেই।

সুরেন ব্যানর্জ্জী রোডে গিয়েছিলাম মাসীমার বাসায়! সেখানে দেখা করে যাচ্ছি শরৎ ঘোষের ষ্ট্রীটে এক বন্ধুর বাসায়। বন্ধুবর অনেক দিন থেকে তাঁর অভিমান জানাচ্ছেন। ইটালী মার্কেটের ভেতর দিয়ে সহজসাধ্য সুবিধা রাস্তা করছি।

মার্কেটে এক প্রত্যাসিত ঘটনা ঘটল! কোন দিন ঘটবে বলে করিনি! অপ্রত্যাশিতকে প্রত্যাশা কেউই করেনা!